প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

বনজ নার্সারি ও উদ্ভিদের রোগ এবং পোকা-মাকড় দমন ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
ষোলশহর, চট্টগ্রাম
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
জুন, ২০২১

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

বনজ নার্সারি ও উদ্ভিদের রোগ এবং পোকা-মাকড় দমন ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
ষোলশহর, চট্টগ্রাম
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
জুন, ২০২১

প্রকাশকাল
জুন, ২০২১

প্রকাশক/ প্রকাশনায়
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

গ্রন্থস্বত্ব
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

রচনায়
ড. মোঃ আহসানুর রহমান
মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান
শামীমা নাসরীন
বন রক্ষণ বিভাগ

অর্থায়নে
টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প
বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর, বন ভবন
আগারগাঁও, ঢাকা।

মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ : তিশা এন্টারপ্রাইজ, ৩২ নারিন্দা, ঢাকা-১১০০।
ফোন : ০১৮১৯-২৯৯৪৩০।

সতর্কতা :
সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত, যথাযথ কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বই বা এর কোন অংশ, কোন ফর্ম বা কোন উপায়ে, ইলেকট্রনিক বা যান্ত্রিক মাধ্যমে, ফটোকপি, রেকর্ডিং বা কোনও তথ্য ভান্ডারে সংরক্ষণ করা এবং পুনরুৎপাদন পদ্ধতি যা বর্তমানে জানা নেই বা যা ভবিষ্যতে আবিষ্কার হতে পারে সহ যে-কোন মাধ্যমে পুনরুৎপাদন করা যাবে না।

বাণী

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) দেশের বন ও বনজ সম্পদের উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবহার বিষয়ক গবেষণার একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। বনজ সম্পদের সুষ্ঠু ও বিজ্ঞান সম্মত ব্যবহার বিষয়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালে "ফরেস্ট প্রোডাক্টস ল্যাবরেটরি" নামে প্রতিষ্ঠানটির পথ চলা শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৬৮ সালে বনজ সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গবেষণা শুরু করার মাধ্যমে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। বিএফআরআই এর মূল লক্ষ্য হলো দেশের বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি, সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সমূহ ভোক্তা পর্যায়ে সম্প্রসারণ।

বাংলাদেশ বন গবেষণ ইনস্টিটিউট এর গবেষণা কার্যক্রম বন ব্যবস্থাপনা ও বনজ সম্পদ উইং এর আওতায় ১৭টি গবেষণা বিভাগ, ০১টি শাখা এবং ২২টি ফিল্ড স্টেশনের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে উন্নত জাত ও গুণগত মানসম্পন্ন প্লান্টিং ম্যাটেরিয়াল উৎপাদন, বাঁশ, বেত, পাটিপাতা ও অন্যান্য অকাষ্ঠল বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সামাজিক বনায়ন ও সুষ্ঠু খামার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, বৃক্ষ প্রজনন ও উন্নয়ন, বন ব্যবস্থাপনা ও বনবাগান উত্তোলন পদ্ধতি, জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বনজ সম্পদের ইনভেন্টরি, বৃদ্ধি এবং উৎপাদন হার নিরূপন, বন মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও ওয়াটার শেড ব্যবস্থাপনা, বনব্যাধি ও কীট-পতঙ্গ ব্যবস্থাপনা, বনজ সম্পদের ভৌত ও রাসায়নিক ব্যবহার এবং বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন ও উদ্ভাবন বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটি গবেষণা পরিচালনা করছে। প্রতিষ্ঠানটির উদ্ভাবিত গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি সমূহ মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন ভোক্তা সংস্থাসহ ব্যক্তি পর্যায়ে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং প্রযুক্তি সমূহ সম্প্রসারণে বিভিন্ন সংস্থার সাথে যৌথভাবে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিএফআরআই, বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্পের সাথে যৌথ ভাবে প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং প্রকল্প এলাকায় বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয়বর্ধক কাজের সুযোগ বৃদ্ধি করা। প্রকল্পটি দেশের ২৮টি জেলার ১৬৫টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে বিএফআরআই, বন অধিদপ্তরের সাথে যৌথভাবে কাজ করছে। দেশের বনজ সম্পদের বৃদ্ধি, উন্নয়ন ও যথাযথ ব্যবস্থাপনার উপর বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সমূহ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এবং বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারি ও ব্যক্তি পর্যায়ের বন নির্ভর ভোক্তা গোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে **"বনজ নার্সারি ও উদ্ভিদের রোগ এবং পোকা-মাকড় দমন ব্যবস্থাপনা"** বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি প্রশিক্ষণার্থীসহ অন্যান্য ভোক্তাগোষ্ঠীর কাজে সহায়ক ও জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি প্রস্তুত করায় আমি সংশ্লিষ্ট গবেষণা বিভাগের গবেষকবৃন্দ এবং ম্যানুয়ালটির মুদ্রণ কাজে আর্থিক সহযোগিতার জন্য সুফল প্রকল্প, বন অধিদপ্তর এবং বিশ্ব ব্যাংক কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ড. রফিকুল হায়দার
পরিচালক
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
চট্টগ্রাম।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় : উদ্ভিদের রোগ, রোগের গুরুত্ব, প্রকারভেদ ও রোগের কারণসমূহ	
উদ্ভিদ রোগ	১
উদ্ভিদ রোগের লক্ষণ ও প্রকারভেদ	১
রোগের অনুকূল অবস্থা	২
রোগ জরিপ ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ	২
উদ্ভিদ রোগের গুরুত্ব	২
উদ্ভিদ রোগের শ্রেণীবিন্যাস	৩
উদ্ভিদ রোগের কারণ	৩
উদ্ভিদ রোগ বিকাশে আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব	৪
দ্বিতীয় অধ্যায়: উদ্ভিদের পুষ্টি, পুষ্টি উপাদান ও পুষ্টির অভাবজনিত লক্ষণ	
উদ্ভিদ রোগ বিকাশে খাদ্য উপাদানের প্রভাব	৫
পুষ্টিজনিত রোগ	৫
তৃতীয় অধ্যায়: ছত্রাকনাশক এবং মাটি শোধন পদ্ধতি	
ছত্রাকনাশক	৭
ছত্রাকনাশকের শ্রেণীবিভাজন	৭
বোর্দো মিশ্রণ	৮
বোর্দোপেস্ট	৮
বীজতলার মাটি শোধন পদ্ধতি	৯
চতুর্থ অধ্যায়: বনজ নার্সারি ও উদ্ভিদের কতিপয় রোগের লক্ষণ, কারণ ও প্রতিকার	
ঢলে পড়া রোগ	১০
পাতায় দাগ পড়া রোগ	১১
শিকড় পচন রোগ	১২
গোড়া পচা বা কাণ্ড পচা রোগ	১৩
পাউডারী মিলডিউ রোগ	১৪
মোজাইক রোগ	১৪
এনথ্রাকনোজ রোগ	১৫

ক্যাংকার রোগ	১৬
আঠা ঝরা (গামোসিস) রোগ	১৭
পাতা ঝলসানো রোগ	১৮
পঞ্চম অধ্যায়: কীট-পতঙ্গের পরিচিতি, গঠন, শ্রেণীবিন্যাস ও বাস্তুতন্ত্র	
কীট-পতঙ্গের পরিচিতি, জীবনচক্র, ক্ষতির ধরণ ও স্বভাব	১৯
ষষ্ঠ অধ্যায়: কীটনাশক/আপদনাশকের প্রকারভেদ, ফরমুলেশন ও ব্যবহার পদ্ধতি	
কীটনাশক/আপদনাশক নির্বাচন ও প্রকারভেদ	২১
কীটনাশক ব্যবহারের সুবিধা, প্রয়োগ ও সাবধানতা	২৩
সপ্তম অধ্যায়: নার্সারির প্রধান প্রধান পোকা-মাকড় পরিচিতি ও তাদের ব্যবস্থাপনা	
উইপোকা ও পিঁপড়া	২৪
উড়চুংগা	২৫
কাটওয়ার্ম	২৫
কক্‌কেফার	২৬
রস শোষণকারী পোকা	২৬
পাতাভোজী পোকা	২৭
কাণ্ডছিদ্রকারী পোকা	২৭
মাকড়	২৮
অষ্টম অধ্যায়: বনজ উদ্ভিদের ক্ষতিকর পোকামাকড় ও তাদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা	
সেগুনের পাতাভোজী পোকা	২৯
মেহগনির ডগা ছিদ্রকারী পোকা	২৯
কড়ই এর পাতাভোজী পোকা	৩০
অর্জুন পাতার গল পোকা	৩১
নিমের রস শোষক বা মশক বাগ	৩১
ইপিল ইপিল সাইলিড পোকা	৩২
কাঠ বাদামের পাতাভোজী পোকা	৩৩
নবম অধ্যায়: সমন্বিত রোগ বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি	
আইপিএম	৩৪
আইডিএম	৩৭
উপসংহার	৪০

প্রথম অধ্যায়

উদ্ভিদের রোগ, রোগের গুরুত্ব, প্রকারভেদ ও কারণসমূহ

উদ্ভিদ রোগ

উদ্ভিদ রোগ হল উদ্ভিদের যে কোন অস্বাভাবিক অবস্থা যা উদ্ভিদের শরীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া, উদ্ভিদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য এবং উদ্ভিদের কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে। এটি উদ্ভিদের ফলন ও গুণগত মান হ্রাস করে। উদ্ভিদ রোগের প্রকৃতি, কারণ ও প্রতিরোধের ধরণের উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদ রোগতত্ত্বকে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বলতে সংক্রামক রোগ সৃষ্টিকারী জীব (ছত্রাক, ওমাইসিটিস, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ফাইটোপ্লাজমস, প্রোটোজোয়া, নেমাটোড এবং পরজীবী উদ্ভিদ) এবং পরিবেশগত অবস্থার দ্বারা সৃষ্ট রোগগুলির বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে বুঝায়। উদ্ভিদ রোগতত্ত্বে প্যাথোজেন সনাক্তকরণ, রোগের কারণ, রোগ চক্র, অর্থনৈতিক প্রভাব, রোগের মহামারি, রোগ প্রতিরোধ এবং রোগ পরিচালনা সম্পর্কে আলোচিত হয়। আধুনিক উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিষয়টি জীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, বংশগতিবিদ্যা, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, জৈব রসায়ন এবং জৈব প্রযুক্তি এর সাথে সম্পর্কযুক্ত।

উদ্ভিদ রোগের লক্ষণ ও প্রকারভেদ

রোগের লক্ষণ রোগের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। রোগের লক্ষণকে ২ ভাবে ব্যক্ত করা যায়- প্রাথমিক লক্ষণ (Primary symptoms) ও আনুষঙ্গিক লক্ষণ (Secondary symptoms)। প্রাথমিক লক্ষণ আক্রান্ত স্থানেই দেখা যায়। অর্থাৎ একটি গাছের কোন অংশে যখন রোগাক্রান্ত হয় তখন থেকেই গাছের ঐ অংশের কোষগুলির স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা লোপ পেতে থাকে। এর ফলে, ঐ স্থানে যে লক্ষণ দেখা যায় তাই রোগের প্রাথমিক লক্ষণ। প্রাথমিক লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পর আক্রান্ত স্থান হতে দূরের কোন আক্রান্ত স্থানে কোন কোন সময় ভিন্ন ধরনের লক্ষণ দেখা দেয়। এই লক্ষণগুলিকে আনুষঙ্গিক লক্ষণ বলে। আনুষঙ্গিক লক্ষণ ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। রোগের বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝানো যেতে পারে। কোন জীবাণু দ্বারা গাছের কাণ্ড বা ডাল আক্রান্ত হলে ক্ষতস্থানের কাঠ বের হয়ে আসে এবং এই অনাবৃত কাঠের চারিধারে বিশেষ ধরনের তন্তুর দ্বারা বেষ্টিত হয়ে ক্যাঙ্কার রোগ সৃষ্টি করে। এই ক্যাঙ্কারই রোগের প্রাথমিক লক্ষণ। ক্যাঙ্কারের ফলে আক্রান্ত স্থানের উপরের দিকে পর্যাপ্ত পানি ও খাদ্য উপাদান পৌঁছাতে পারে না। ফলে, আগার দিকে অনাক্রান্ত স্থানের পাতা ও ডালের কচি অংশে ঢলে পড়ে। এই ঢলে পড়াটাই ক্যাঙ্কার রোগের আনুষঙ্গিক লক্ষণ। উদ্ভিদ রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে রোগের লক্ষণসমূহ পর্যালোচনা করে রোগ ও রোগের কারণ নির্ণয় করতে হয়। রোগের লক্ষণগুলি সকল গাছের ক্ষেত্রে এক নয়।

প্রকার বিশেষ উদ্ভিদ রোগের প্রাথমিক ও আনুষঙ্গিক লক্ষণগুলিকে মোটামুটি ৩ ভাবে বিভক্ত করা যেতে পারে যেমন ঃ ক) নেক্রোটিক খ) হাইপোপ্লাস্টিক এবং গ) হাইপারপ্লাস্টিক।

ক) নেক্রোটিক লক্ষণ ঃ এ লক্ষণ উদ্ভিদ কোষ বা কলার মৃতজনিত লক্ষণকে বুঝায়। আক্রান্ত স্থানের মৃত টিস্যু পচে বাদামী রঙ ধারণ করাকে নেক্রোসিস বলে। নেক্রোসিসের দরুণ গাছের ত্বকে ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং নানান প্রকারের দাগ উৎপন্ন হয়। নেক্রোসিসের লক্ষণগুলি সাধারণত নিম্নোক্ত ধরনের হয়। যেমন ঃ (১) দাগ (২) ব্লাস্টিং (৩) মড়ক বা ব্লাইটিং (৪) ব্লটিং (৫) ক্যাঙ্কার (৬) ডাই-ব্যাক (৭) এনথ্রাকনোজ (৮) পচন (৯) নেতিয়ে পড়া বা ড্যাম্পিং অফ (১০) ঢলে পড়া (১১) পাতা ঝরা (১২) গামোসিস (১৩) হাইড্রোসিস (১৪) স্কচিং (১৫) স্ক্যাব (১৬) সিলভারিং এবং (১৭) মামিফিকেশন।

খ) হাইপোপ্লাস্টিক লক্ষণ ঃ কোষ বিনষ্ট হওয়ার অথবা কোষ বিভাজনের মন্থরতার ফলে গোটা গাছের অথবা এর কো অংশ বিশেষের বৃদ্ধির মন্থরতার ফলে যে লক্ষণ প্রকাশ পায় তাকে হাইপোপ্লাস্টিক লক্ষণ বলা হয়। হাইপোপ্লাস্টিক লক্ষ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যেমন ঃ (১) ইটিয়োলেশন (২) এলবিকেশন (৩) ক্লোরোসিস (৪) মোজাইক (৫) মট (৬) শিরা-স্বচ্ছতা (৭) বামনত্ব (৮) রোসেটিং এবং (৯) পাকরিং।

গ) হাইপারপ্লাস্টিক লক্ষণ ঃ অস্বাভাবিক কোষ বিভক্তির ফলে কোষ সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটায় অথবা কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ফলে গাছের বিভিন্ন অংশের স্ফীত হয়ে উঠায় এই লক্ষণ প্রকাশ পায়। হাইপারপ্লাস্টিক লক্ষণ বিভিন্ন ধরনের হতে পা যেমন ঃ (১) অর্বুদ (২) কার্লিং (৩) ফ্যাসসিয়েশন (৪) ফ্যাসসিকুলেশন (৫) রাসেটিং (৬) জামাটে (৭) সারকভি (৮) স্ক্য (৯) ভাইরেসেন্স (১০) টিউমিফিকেশন এবং (১১) হাইপারট্রফি।

রোগের অনুকূল অবস্থা

উদ্ভিদের রোগ সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ দরকার, যেমন- পানি, আর্দ্রতা, রোদ, আলো, বাতাস ইত্যাদি। আবার কো কোন রোগ বিশেষত ভাইরাস রোগের জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন বাহক পোকা, যেমন-জাব পোকা, সাদা মাছি, সবু পাতা ফড়িং, জ্যাসিড ইত্যাদির মাধ্যমে। কাজেই নার্সারিতে রোগের উপস্থিতির চেয়ে সেসব রোগ বিস্তারের জন্য অনুকূ পরিবেশ বা অবস্থা এবং বাহক পোকার উপস্থিতিও গুরুত্বপূর্ণ। এর সাথে পোষক বা আশ্রয়দাতা প্রয়োজন। কেননা এক রোগ নার্সারির সব গাছেই হয় না। আবার এমন কিছু রোগ রয়েছে যা একাধিক গাছে হয়, যেমন- মোজাইক রোগ, শিক পচন রোগ ইত্যাদি। নার্সারিতে শুধু জীবাণু উপস্থিত থাকলেই হবে না। জীবাণুর সাথে সাথে রোগের জন্য দরকা আশ্রয়দাতা গাছ বা পোষক এবং অনুকূল পরিবেশ। তাই, সঠিক রোগ ব্যবস্থাপনার জন্য এবং ব্যবস্থাপনার খরচ কমাতে রোগ সৃষ্টির অনুকূল অবস্থা সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার। গোড়া পচন, শিকড় পচন ইত্যাদি রোগ ভেজা বা স্যাঁতস্যাঁতে জমিতে বেশি হয় সেজন্য অনেক ছত্রাক রোগের জীবাণু বৃষ্টি দ্বারা ব্যাপকভাবে নার্সারিতে ছড়িয়ে পড়ে। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি ঘন কুয়াশায় কোন কোন রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

রোগ জরিপ ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ

নার্সারি ও বাগানের বিভিন্ন রোগ সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়মিত নার্সারি ও বাগান পর্যবেক্ষণ করতে হবে। জরিপে পূর্বশর্ত হলো রোগ চেনা বা সনাক্তকরণ। এজন্য প্রথমে নার্সারি ও বাগানের গাছের ডগাগুলো ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যদি গাছের ডগায় কুঁকড়ে যাওয়া, হলদে ছোপ হওয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা, ডগা মরে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যা তাহলে বুঝতে হবে বিভিন্ন রোগের লক্ষণ। পাতায় যদি দাগ পড়া, সাদা গুঁড়ো বা পোড়া দাগ ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যা তাহলে বুঝতে হবে ইহাও বিভিন্ন রোগ দ্বারা আক্রান্ত। এরপর কাণ্ড এবং ডাল ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলে যদি বাক পচা, বাকলে দাগ, বাকল ফাটা ইত্যাদি লক্ষণ থাকে তাহলে বুঝতে হবে গাছ বিভিন্ন রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। এস রোগজনিত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করে অনুমান ও হিসাব কষে যদি দেখা যায় রোগের অনুকূল অবস্থা বিরাজ করে এবং আর্থি ক্ষতি ঘটার সম্ভাবনা থাকে তাহলে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার উপায় বেছে নিয়ে সেভাবে কাজ করতে হবে। রোগজনিত ক্ষয়ক্ষ বিভিন্নভাবে নিরূপণ করা যায়। যেমন ঃ নার্সারি ও বাগানের কত শতাংশ গাছ রোগ দ্বারা আক্রান্ত বা পাতার কত শতাং ক্ষতিগ্রস্থ, শতকরা কি পরিমাণ চারা গাছ মারা যাচ্ছে ইত্যাদি।

উদ্ভিদ রোগের গুরুত্ব

উদ্ভিদ রোগগুলি মানুষের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইহা গাছপালা এবং উদ্ভিদজাত পণ্যের ক্ষতি করে যার উপ মানুষের খাদ্য, পোষাক, আসবাব, পরিবেশ এবং অনেক ক্ষেত্রে আবাসন নির্ভর করে। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে আয়ারল্যান্ডে গোলআলুর মড়ক রোগের দরুণ প্রায় ১০ লক্ষ লোক অনাহারে মৃত্যুবরণ করে এবং ১০ লক্ষ লোক দেশ ছেড়ে ইউরো

ও আমেরিকায় চলে যায়। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে অবিভক্ত বাংলায় খাদ্যাভাবে প্রায় ২০ লক্ষ লোক শোচনীয়ভাবে প্রাণ হারায়। এই খাদ্যাভাবের সঙ্গে এবং অন্যান্য কারণের সঙ্গে ধান গাছের বাদামী দাগ রোগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রোগ যে শুধু ফসলেরই ক্ষতি করে থাকে তা নয়, উদ্ভিদজাত দ্রব্যেরও প্রচুর ক্ষতি সাধন করে থাকে। উদ্ভিদ রোগের ফলে গাছের অকাল মৃত্যু ঘটে থাকে। মৃত্যু না হলেও গাছে ফলন অনেক কম হয় এবং সার্বিক দিক দিয়ে কৃষক অনেক ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

উদ্ভিদ রোগের শ্রেণিবিন্যাস

উদ্ভিদের রোগ বিভিন্নভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা যায়।

১) **উদ্ভিদ-প্রকার ভিত্তিক রোগ শ্রেণিবিভাজন ঃ** এই পদ্ধতিতে একই ধরনের উদ্ভিদের রোগকে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়, যেমন ঃ (ক) ফসলের রোগ (খ) শাক-সব্জির রোগ (গ) ফল গাছের রোগ (ঘ) শোভা বর্ধক গাছের রোগ (ঙ) ঔষধি গাছের রোগ (চ) বনজ বৃক্ষের রোগ ও (ছ) কাঠ উৎপাদনকারী গাছের রোগ।

২) **নিদান ভিত্তিক রোগ শ্রেণিবিভাজন ঃ** রোগের কারণ বিশ্লেষণ করে উদ্ভিদরোগকে প্রধানত ৩ ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা- (ক) পরজীবীজনিত রোগ (খ) অপরজীবীজনিত রোগ ও (গ) মাইকোপ্লাজমাজনিত রোগ।

৩) **লক্ষণ ভিত্তিক রোগ শ্রেণিবিভাজন ঃ** অনেক সময় রোগের লক্ষণ অনুযায়ী উদ্ভিদ রোগের নামকরণ করা হয়, যথা- (ক) ঢলে পড়া রোগ (খ) পোড়া রোগ (গ) নরম পচা রোগ (ঘ) নেতিয়ে পড়া রোগ (ঙ) মরিচা পড়া রোগ (চ) ঝুল রোগ (ছ) পাতায় দাগ পড়া রোগ ইত্যাদি।

৪) **রোগ-সংঘটন বা রোগের আবির্ভাব, বিস্তার ও সংক্রমণাধিক্য ভিত্তিক রোগ শ্রেণিবিভাজন ঃ** রোগ সংঘটনের সম্বন্ধ অনুসারে রোগকে প্রধানত ৪ ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন- (ক) স্থানীয় বা আঞ্চলিক রোগ (খ) বিক্ষিপ্ত রোগ (গ) পৃথিবীব্যাপী রোগ (ঘ) এপিফাইটিক রোগ।

৫) **উৎস ভিত্তিক রোগ শ্রেণিবিভাজন ঃ** রোগের উৎপত্তিস্থলের উপর নির্ভর করে এই শ্রেণীবিভাজন করা হয়েছে, যথা- (ক) বীজবাহিত ও (খ) মাটিবাহিত।

৬) **সম্প্রসারণ ভিত্তিক রোগ শ্রেণিবিভাজন ঃ** গাছে রোগ বিস্তৃতির উপর ভিত্তি করে ২ ভাগে ভাগ করা যায়, যথাঃ- (ক) স্থানিক রোগ ও (খ) সর্বাঙ্গীয় রোগ।

উদ্ভিদ রোগের কারণ

গাছপালা ও ফসলাদির রোগের মূলে যেসব কারণ জড়িত আছে তাদেরকে প্রধানত ৩ ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন- (ক) জীবীয় কারণ (খ) অজীবীয় কারণ ও (গ) ভাইরাস ঘটিত কারণ।

ক) জীবীয় কারণ ঃ জীবীয় কারণ বলতে পরজীবীকে বুঝায়। পরজীবী এমন জীব যারা অন্য জীবের দেহ হতে আহার্য গ্রহণ করে বেঁচে থাকে। যেসব পরজীবী উদ্ভিদকে আক্রমণ করে রোগ সৃষ্টি করে থাকে তারা হলো-

১) **উদ্ভিদ ঃ** স্লাইম মোল্ড, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, শৈবাল ও সপুষ্পক পরগাছা।

২) **প্রাণি ঃ** কৃমি, পোকামাকড়, মাইট ইত্যাদি।

৩) **ভাইরাস ও মাইকোপ্লাজমা।**

খ) অজীবীয় কারণ সমূহ ঃ অজীবীয় ও অপরজীবী বস্তু শারীরবৃত্তীয় রোগ উৎপন্ন করে। প্রধান প্রধান অপরজী
কারণসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

১) মাটি ঃ মাটির গঠন, আর্দ্রতার অসাম্য, অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব, পুষ্টির অসাম্য ইত্যাদি।

২) আবহাওয়া ঃ উচ্চ ও নিম্ন তাপমাত্রা, আপেক্ষিক আর্দ্রতা, আলোর স্বল্পতা ও আধিক্য, বায়ুর গতিবেগ, বজ্রপা
শিলাবৃষ্টি, তুষার ঝড়, বরফ ইত্যাদি।

৩) দূষিত বায়ুমন্ডল ঃ কলকারখানা হতে নির্গত ধোঁয়া, বিষাক্ত গ্যাস, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, সালফার-ডাই-অক্সাই
ইত্যাদি।

৪) রাসায়নিক পদার্থ ঃ ছত্রাক ও পতঙ্গনাশক, লতাপাতানাশক ইত্যাদি।

গ) ভাইরাস ঃ জীবীয় ও অজীবীয় কারণসমূহের মাঝামাঝি এক প্রকার রোগ সৃষ্টিকারী এজেন্টকে ভাইরাস নাম দেও
হয়েছে।

চিত্র ঃ কালচার মিডিয়ামে ব্যাকটেরিয়ার কলোনী।

চিত্র ঃ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে দৃশ্যমান ছত্রাকের কনিডিয়া (*Fusarium* sp.)।

চিত্র ঃ পোষক গাছে জন্মানো পরগাছা (স্বর্ণলতা)।

চিত্র ঃ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে দৃশ্যমান কৃমি বা নেমাটোড

উদ্ভিদ রোগ বিকাশে আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব

আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বলতে সাধারণত বায়ুর উত্তাপ, জলীয়বাষ্প, বায়ুর অক্সিজেন ও নানা প্রকার দূষিত গ্যা
বৃষ্টিপাত, শিশির, মেঘ, রৌদ্রকিরণ, মাটির আর্দ্রতা, মাটির উষ্ণতা, মাটির অম্লত্ব, মাটির উৎপাদন ক্ষমতা প্রভৃতিকে বুঝা
এদের প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে রোগ উৎপাদনে সহায়তা করে। রোগ বিকাশে আবহাওয়ার প্রভাব বিবেচনা
উদ্ভিদ রোগকে মোটামুটি ৩ ভাগে ভাগ করা যায়, যথা ঃ

১) মৃত্তিকাস্থিত জীবাণুজনিত রোগ।

২) বায়ুস্থিত জীবাণুজনিত রোগ।

৩) সংরক্ষণ ও পরিবহণজনিত রোগ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উদ্ভিদের পুষ্টি, পুষ্টি উপাদান ও পুষ্টির অভাবজনিত লক্ষণ

উদ্ভিদ রোগ বিকাশে খাদ্য উপাদানের প্রভাব

মাটির উর্বরতার উপর গাছের স্বাস্থ্য একান্তভাবে নির্ভরশীল। মাটিতে উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য উপাদানের অভাব হলে গাছের দেহক্রিয়ায় গোলযোগ দেখা দেয় এবং গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে, গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকাংশে লোপ পায় এবং নানারকম রোগ-জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ে। সবল গাছেও রোগ হতে পারে। সাধারণত পরজীবী সবল গাছেই বেশি হয় এবং দ্রুত বৃদ্ধি পায়। উদ্ভিদ মাটি হতে ৭টি মৌলিক পদার্থ, যেমন ঃ নাইট্রোজেন (N), পটাসিয়াম (K), ফসফরাস (P), ক্যালসিয়াম (Ca), ম্যাগনেসিয়াম (Mg), লোহা (Fe) ও গন্ধক (S) অধিক পরিমাণে পুষ্টির জন্য গ্রহণ করে। সাধারণত মাটিতে ৩টি মৌলিক পদার্থ, যেমন- নাইট্রোজেন, পটাসিয়াম ও ফসফরাস সার হিসাবে ব্যবহার হয়ে থাকে। মাটিতে এ সকল পদার্থের প্রয়োজনীয় তারতম্যের জন্য গাছে রোগ দেখা দিতে পারে, যেমন- গাছ ছোট হওয়া, পাতা হলুদ হওয়া, পাতা ও ফুল ঝরে যাওয়া ইত্যাদি। উপর্যুক্ত ৭টি মৌলিক পদার্থ ব্যতিরেকে আরও কতকগুলি পদার্থ আছে, যেমন- দস্তা (Zn), ম্যাঙ্গানিজ (Mn), ও তামা (Cu) যাহা খুবই অল্প পরিমাণে গাছ গ্রহণ করে। এই অপ্রধান মৌলিক পদার্থের অভাবে গাছের দেহ ক্রিয়ায় গোলযোগ দেখা দেয়। আবার বেশি হলেও উহারা বিষাক্ত দ্রব্যের ন্যায় কাজ করে। এ সকল মৌলিক পদার্থের অভাবহেতু গাছের দেহ-ক্রিয়ায় গোলযোগ ঘটে এবং গাছের প্রকৃত পুষ্টিসাধন হয় না। যার ফলে গাছে রোগ দেখা যায়।

পুষ্টিজনিত রোগ

ক) **নাইট্রোজেন ঘাটতি ঃ** মাটিতে নাইট্রোজেন এর ঘাটতি হলে গাছের পাতা হলুদ হয়ে যায়। সাধারণত নিচের পাতা উপরের পাতা অপেক্ষা বেশি হলুদ হয়। পরে, ঐ হলুদ রং ধীরে ধীরে বাদামী হয়ে যায়। গাছের কাণ্ড অপেক্ষাকৃত সরু হয়। কাণ্ড ও পত্র শিরায় অনেক সময় লালচে দাগ পড়ে।

খ) **ফসফরাস ঘাটতি ঃ** এই উপাদানের অভাব হলে গাছের কোষ বিভক্তিকরণ ভাল হয় না। এর ফলে গাছ বামনাকৃতির হয়। পর্ব ছোট হয়। গাছের পাতা গাঢ় সবুজ বর্ণ ধারণ করে। তবে পাতার মধ্য শিরার আশপাশ পীতাভ হয়ে অনেক পাতা ঝরে পড়ে এবং বিলম্বে ফল ধরে। ফসফরাসের অভাবে গাছে সেলুলোজ ও স্টার্চ কম হয় এবং এমিনো এসিড কম পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

গ) **পটাসিয়াম ঘাটতি ঃ** এ উপাদান শর্করা ও প্রোটিন উৎপাদনে সাহায্য করে এবং কোষে জলীয় অংশের অনুপাত রক্ষা করে। গাছের পাতার কিনারা অনেক সময় তামাটে হয়ে যায়। অনেক সময় পাতা হতে বেশি পানি বের হয়ে যাওয়ায় ক্লোরোসিস হয়। গাছের গোড়ার পাতায় ফোটা ফোটা দাগ পড়ে এবং পাতার আগা মরে যায়। অনেক ক্ষেত্রে পাতা কুঁচকিয়ে কিংবা মুড়িয়ে যায় এবং সম্পূর্ণ গাছে মরিচার মতো দাগ পড়ে।

ঘ) **ম্যাগনেসিয়াম ঘাটতি ঃ** গাছের সবুজ কণায় ম্যাগনেসিয়াম থাকে। সুতরাং এ উপাদানের অভাব প্রথম পাতায় ধরা পড়ে এবং বয়স্ক পাতায় ইহা প্রথম পরিস্ফুট হয়ে উঠে। এর অভাবে সবুজ কণার অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং গাছের পাতা সবুজ রং হারিয়ে হলদে হয়ে যায়। অনেক সময় ডাটার মাঝখানটা সাদা হয়ে যায়। পাতার কিনারা উপরের দিকে

বেঁকে উঠে। ম্যাগনেসিয়াম এর অভাব বেশি হলে নিচের পাতা মরে যায় এবং কিছু কিছু অথবা সব পাতা ঝরে পড়ে।

ঙ) ক্যালসিয়াম ঘাটতি ঃ ক্যালসিয়াম গাছকে সোজাভাবে দণ্ডায়মান রাখতে সহায়তা করে। এর অভাবে স্বাভাবিক বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে গাছ বামনাকৃতির হয়। পাতা বিকৃত ও উহার অগ্রভাগ বাঁকা হয়ে যায়।

চ) দস্তা ঘাটতি ঃ দস্তার অভাবে গাছের পাতায় ঈষৎ হরিদ্রাভ ছিট ছিট দাগ পড়ে। পাতার উপরে কোঁকড়ানো রেখা দেখা যায়। পাতা ছোট, শুষ্ক ও শক্ত হয়ে যায়।

ছ) বোরন ঘাটতি ঃ বোরন এর অভাবে গাছের পাতায় হালকা হলুদাভাব ছোট ছোট দাগ পড়ে। পাতা কুঁকড়ে যায় এবং আকারে ছোট হয়। ফল ছোট ও শুষ্ক হয়ে যায়।

জ) লোহা ঘাটতি ঃ গাছের সবুজ কণা তৈরি করতে লোহার প্রয়োজন। এর অভাবে পাতার সবুজ রং নষ্ট হয়ে যায় এবং অভাবজনিত লক্ষণ প্রথমে কচি পাতায় প্রকাশ পায়। কুঁড়ি পাতায় এর অভাব হলে শিরা ও উপশিরাগুলি সাদা হয়ে যায়। অনেক সময় সম্পূর্ণ পাতা সাদা হতে পারে।

ঝ) ম্যাঙ্গানিজ ঘাটতি ঃ লোহার ন্যায় ইহাও সবুজ কণা তৈরির জন্য প্রয়োজন। এর অভাবে প্রথমে কচি কচি পাতাগুলি এবং পরের নিচের পাতাগুলি হলদে হতে থাকে। অনেক সময় পাতার কিনারা ভিতরের দিকে মুড়িয়ে যায়। গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি থাকে না এবং মুকুল হয় না।

ঞ) তামা ঘাটতি ঃ তামার অভাবে পাতার রং গাঢ় সবুজ অথবা কিছুটা নীল বর্ণ হয়ে যায়। পাতার কিনারা উপরের দিকে মুড়িয়ে যায়। শিকড়ের বৃদ্ধি বন্ধ হয়। শাখা মূল অপেক্ষাকৃত চিকন ও সাদাটে হয়। তামার অভাব প্রকট হলে অনেক ফল ও গাছের কচি শাখার অগ্রভাগ শুকিয়ে মারা যায়। এ ধরনের লক্ষণকে ডাই-ব্যাক বলা হয়।

তৃতীয় অধ্যায়
ছত্রাকনাশক এবং মাটি শোধন পদ্ধতি

ছত্রাকনাশক

যে সকল রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে ছত্রাকজনিত রোগ দমন করা হয় তাকে ছত্রাকনাশক বলে। বাজারে বহু ধরণের ছত্রাকনাশক পাওয়া যায়। কিন্তু সার্বিকভাবে ব্যবহৃত কোন ছত্রাকনাশক নাই। রোগের প্রকৃতিভেদে তা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পোষক ও পরজীবীর সংবেদনশীলতার উপর ভিত্তি করে ছত্রাকনাশক রোগ দমনের জন্য গাছে ব্যবহার করা হয়। কারণ, সব ছত্রাকের প্রজাতি সব ছত্রাকনাশকের প্রতি সংবেদনশীল নয়। আবার পোষকের সংবেদনশীলতার জন্য অনেক ছত্রাকনাশক গাছে প্রয়োগ করা যায় না। ছত্রাকনাশক নির্বাচনের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় ঃ

(ক) পোষকের কোন ক্ষতিসাধন হয় কি না (খ) পরজীবী মারা যায় কি না অথবা কতটা সংবেদনশীল (গ) ছত্রাকনাশক দামে সস্তা কি না (ঘ) উহার ব্যবহার পদ্ধতি সহজ কি না (ঙ) উহা আঠালো কি না অর্থাৎ পোষকের গায়ে ভালোভাবে লেগে থাকতে পারে কি না (চ) কোষতলে সহজে বিস্তৃত হতে পারে কি না (ছ) মানুষ ও জীবজন্তুর কোন ক্ষতি করে কি না এবং (জ) কতদিন উহার কার্যক্ষমতা অক্ষুন্ন থাকে।

ছত্রাকনাশকের শ্রেণিবিভাজন

ছত্রাকনাশককে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা-

১) কার্যকারিতা ভিত্তিক শ্রেণিবিভাজন

ক) **সিস্টেমিক ছত্রাকনাশক ঃ** যে ছত্রাকনাশক গাছে ছিটানোর পর সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে তাকে বলা হয় সিস্টেমিক ছত্রাকনাশক। যেমনঃ কার্বেনডাজিম।

খ) **ননসিস্টেমিক ছত্রাকনাশক ঃ** এই ছত্রাকনাশক পোষক বিশোষণ করে না এবং বিশোষিত হলেও সর্বাঙ্গে বিস্তারিত হয় না। যেমনঃ ম্যানকোজেব, কপার, ম্যানেব ইত্যাদি।

২) উপাদান ভিত্তিক শ্রেণিবিভাজন

ক) **অজৈব তাম্র জাতীয় ছত্রাকনাশক ঃ** যে সব ছত্রাকনাশকে তামার বিভিন্ন যৌগ প্রধান অংশ হিসেবে বিদ্যমান থাকে তাকে বুঝায়, যেমন-বোর্দোমিক্সার, কুপ্রাভিট ইত্যাদি।

খ) **অজৈব গন্ধক জাতীয় ছত্রাকনাশক ঃ** যেসব ছত্রাকনাশকে অজৈব গন্ধক থাকে তাকে বুঝায়, যেমন- লাইম সালফার, গন্ধক চূর্ণ ইত্যাদি।

গ) **জৈব ছত্রাকনাশক ঃ** জৈব পদার্থ দ্বারা তৈরি ছত্রাকনাশককে বুঝায়, যেমন- ডায়াথেন, টিলেক্স, থায়রাম, ক্যাপটান ইত্যাদি।

ঘ) **এন্টিবায়োটিক ঃ** এই ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করলে গাছের সর্বাঙ্গে তা বিস্তৃত হয়ে ছত্রাককে নির্মূল করে। যেমন- সাইক্লোহেক্সিমাইড, গ্রিসিওফুলভিন, ভিরিডিন ইত্যাদি।

৩) রোগ ও জীবাণু বিস্তার পদ্ধতি ভিত্তিক শ্রেণিবিভাজন

ক) **সিঞ্চক ছত্রাকনাশক ঃ** বায়ুবাহিত ছত্রাক রোগ দমনে ছত্রাকনাশক যন্ত্রের সাহায্যে গাছে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। যেমন- বোর্দোমিশ্রচার, বার্গান্ডিমিশ্রচার, লাইম সালফার, সালফার ডাস্ট ইত্যাদি।

খ) **বীজবাহিত রোগের ছত্রাকনাশক ঃ** রুগ্ন বীজ হতে শস্যে নানাপ্রকার রোগ হয়। বীজের সকল রোগ দমনের জন্য নানাপ্রকার রাসায়নিক ঔষধ ব্যবহার করা হয়। যেমন- মারকিউরিক ক্লোরাইড, ফরমালিন ইত্যাদি।

গ) **মাটিবাহিত রোগের ছত্রাকনাশক ঃ** অনেক পরভোজী ছত্রাক মৃতভোজী হিসাবে মাটিতে অনেক দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে। এই সমস্ত ছত্রাক বীজতলায় চারাকে আক্রমণ করে প্রভূত ক্ষতিসাধন করে থাকে। সুতরাং বীজ বপনের পূর্বে বীজতলার মাটি ছত্রাকনাশক দ্বারা শোধন করে মাটি রোগজীবাণু মুক্ত করতে হয়।

বোর্দো মিশ্রণ

বোর্দোমিশ্রচার সবচাইতে পুরাতন ছত্রাকনাশক। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের বোর্দো শহরের কাছে Millardet নামে একজন উদ্ভিদতত্ত্ববিদ প্রথম আবিষ্কার করেন। বোর্দোমিশ্রচার একটি উৎকৃষ্ট ছত্রাকনাশক। কারণ, এটা গাছের গায়ে অনেকদিন লেগে থাকে। এ ছাড়া এটি মানুষের কোন ক্ষতি করে না এবং বিভিন্ন প্রকারের ছত্রাকের আক্রমণ হতে গাছকে রক্ষা করার ক্ষমতাও অনেক বেশি। বোর্দোমিশ্রচারে তামা থাকে যা গাছের ক্লোরোফিল তৈরিতে সহায়তা করে থাকে।

উপকরণ ঃ তুঁতে, কলিচুন ও পানি।

প্রস্তুতপ্রণালী

১% অর্থাৎ শতকরা ১ ভাগ বোর্দো মিশ্রণ তৈরি করার উপকরণ ঃ

তুঁতে = ৮-১০ গ্রাম

কলিচুন = ৮-১০ গ্রাম

পানি = ১ লিটার

প্রথমে অর্ধেক পরিমাণ পানি (৫০০ মি.লি.) একটি মাটির বা কাঠের পাত্রে তুঁতে নিয়ে গুলতে হবে (ধাতব পাত্র কখনো ব্যবহার করা উচিত নয়)। অন্য একটি পাত্রে চুন রেখে তাতে বাকি অর্ধেক পানি অল্প অল্প করে দিয়ে চুন ফুটাতে হবে এবং ঠান্ডা করে ভালভাবে মিশাতে হবে। তুঁতের পানির সাথে চুনের পানি মিশালে ১% বোর্দো মিশ্রণ তৈরি হয়।

বোর্দো পেস্ট

গাছের কাণ্ড বা শাখায় কোন কারণে ক্ষত হলে সে ক্ষতস্থানের মাধ্যমে ছত্রাকঘটিত রোগের সূত্রপাত ঘটে। এ সংক্রমণ বন্ধ করার জন্য ক্ষত স্থানে বোর্দো পেস্ট লাগাতে হয়।

প্রস্তুতপ্রণালী

উপকরণ ঃ তুঁতে, চুন ও পানি।

১ লিটার পানির জন্য ঃ কপার সালফেট (তুঁতে)- ২০০ গ্রাম, চুন - ৩০০ গ্রাম।

প্রথমে অর্ধেক পরিমাণ পানি (৫০০ মি.লি.) একটি মাটির বা কাঠের পাত্রে তুঁতে নিয়ে গুলতে হবে (ধাতব পাত্র কখনও ব্যবহার করা উচিত নয়)। অন্য একটি পাত্রে চুন রেখে তাতে বাকি অর্ধেক পানি অল্প অল্প করে দিয়ে চুন ফুটাতে হবে এবং ঠান্ডা করে ভালভাবে মিশাতে হবে। পরে তুঁতের পানির সাথে চুনের পানি মিশালে বোর্দো পেস্ট তৈরি হয়।

বীজতলার মাটি শোধন পদ্ধতি

বীজতলায় চারা উৎপাদন করা হয়। যদি বীজতলার মাটি উপযুক্ত না হয় তাহলে চারা সবল ও রোগমুক্ত হবে না। এতে ফসলের উৎপাদন কমে যাবে। নীরোগ, সুস্থ ও সবল চারা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন পোকা-মাকড় ও রোগ-জীবাণুমুক্ত বীজতলা। তাই ভাল চারা উৎপাদনের জন্য বীজতলার মাটি শোধন একান্ত জরুরী। প্রায়ই দেখা যায়, বীজতলার চারা নষ্ট বা আক্রান্ত হয় সাধারণত ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, নেমাটোড, মাইকোপ্লাজমা, ভাইরাস ও কিছু কিছু কীটপতঙ্গ দ্বারা। চারা উৎপাদনের আগে বীজতলার মাটি শোধন করে নিলে চারা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই কমে যায়। মাটি শোধনের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে, এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো-

ক) আগুনের তাপ প্রয়োগ

বীজতলার মাটির উপরিভাগে খড় বা বিচালি বিছিয়ে আগুনে পোড়ালে মাটির ৫ সেন্টিমিটার গভীর পর্যন্ত শোধিত হয়। এই পদ্ধতিতে মাটির উপরের কম্পোস্ট, জৈব সার এবং নাইট্রোজেনের কিছুটা অপচয় হতে পারে। মাটির দূষণজনিত বিষাক্ততা এড়াতে শোধনের দু-একদিন পর বীজতলা ব্যবহার করা উচিত।

খ) স্বচ্ছ প্লাস্টিক শিটের মাধ্যমে তাপ সৃষ্টি

এ পদ্ধতিতে স্বচ্ছ প্লাস্টিক শিট দিয়ে বীজতলা প্রায় ৫ থেকে ৭ দিন ঢেকে রাখতে হয়। এর ফলে সূর্যের আলোয় প্লাস্টিক শিটের নিচে পর্যাপ্ত তাপের সৃষ্টি হয়। এতে মাটির নিচে বিদ্যমান রোগ-জীবাণু ও পোকা-মাকড় মারা যায়।

গ) ফরমালিন দ্বারা

ফরমালিন দিয়ে মাটিকে শোধণ করা যায়। ১ ভাগ ফরমালিন (৪০% বাণিজ্যিক ফরমালিন) ১০ ভাগ পানিতে মিশিয়ে ফরমালিন মিশ্রণ তৈরি করা যায়। ফরমালিন পানিতে মিশাবার পূর্বে মাটি ভালভাবে ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। তারপর স্প্রে মেশিন অথবা ঝর্ণা দিয়ে ৫-৬ সে.মি. গভীর পর্যন্ত মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজন হলে প্রথমবার স্প্রে করার পরে মাটিকে কুপিয়ে মাটি উপর নীচ করে নেওয়া যায়, এতে করে উপরের মাটি নিচে চলে যায় এবং ভালভাবে মাটি ভিজে যায়। তারপর পলিথিন কাগজ বা ভিজা চট দিয়ে ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত মাটি ঢেকে রাখতে হবে। এরপর পলিথিন কাগজ উন্মুক্ত করে খোলা অবস্থায় ১০-১৫ দিন পর্যন্ত রেখে দিতে হবে। মাঝে মধ্যে মাটিকে নেড়ে দিতে হবে। মাটি হতে ফরমালিনের গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত বীজতলায় বীজ বপন করা উচিত নয়। কারণ ফরমালিনের গ্যাসে বীজ নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। ১ শতক জমির জন্য ৫ লিটার বাণিজ্যিক ফরমালিন মিশ্রণ প্রয়োগ করতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

বনজ নার্সারি ও উদ্ভিদের কতিপয় রোগের লক্ষণ, কারণ ও প্রতিকার

বনায়নের ক্ষেত্রে নার্সারির গুরুত্ব অপরিসীম। নার্সারি ছাড়া বনায়নের কাজ অসম্পূর্ণই বলা চলে। নার্সারির প্রধান কাজ হলো চারা উৎপাদন, ক্ষণস্থায়ী গাছের সংরক্ষণ, স্থায়ী গাছের ও বীজ উৎপাদনকারী গাছের সঠিক পর্যবেক্ষণ ও পরিচর্ করা। নার্সারি কেবল উন্নতমানের বীজ ও চারার সরবরাহই নিশ্চিত করে না, জনগনের কর্মসংস্থান ও পরিবেশে ভারসাম্যও নিশ্চিত করে। নার্সারিতে চারা বিভিন্ন প্রকার অণুজীব দ্বারা আক্রান্ত হয়। এ ছাড়াও আর্দ্রতা, প্রবল বাতাস অধিক বৃষ্টিপাত, অসম মাত্রায় সার ব্যবহার, কোন কারণে গাছের গায়ে ক্ষতের সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি কারণেও নার্সারিতে চা রোগাক্রান্ত হতে পারে। সঠিক সময়ে এবং সঠিক ব্যবস্থাপনা গ্রহণ না করতে পারলে নার্সারিতে চারার বৃদ্ধি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয় এবং চারা মারা যায়। যার ফলে নার্সারি মালিকরা আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হন। নিম্নে নার্সারিতে পরিলক্ষি প্রধান প্রধান রোগ, রোগের লক্ষণ ও প্রতিকার বিষয়ে আলোচনা করা হলো-

১। ঢলে পড়া রোগ ঃ ঢলে পড়া নার্সারির একটি মারাত্মক রোগ। বীজতলায় বীজ বপনের পর যখন তা গজাতে শুরু করে তখন থেকে এ রোগের আক্রমণ শুরু হয় এবং চারা রোপন পর্যন্ত তা চলতে থাকে। অঙ্কুরিত বীজে ছত্রাকের আক্রমণ শু হলে বীজপত্র, কাণ্ড এবং শিকড় পচে নষ্ট হয়ে যায়। যার ফলে গাছ ঢলে পড়ে এবং মারা যায়। আক্রমণ শুরু হওয়ার ২- দিনের মধ্যেই আক্রান্ত চারা পচে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এমনকি বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার পর চারা মাটির উপরে ওঠা আগেও এ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নষ্ট হতে পারে। নার্সারির বেডে পানির আধিক্য হলে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়। সেগুন, পাইন, ইউক্যালিপটাস, আকাশমনি, কড়ই, মেহগনি, গামার, পেয়ারা, কদম ইত্যাদি প্রজাতির চারায় এ রোগ দেখা যায়।

কারণ ঃ এটি মূলত ছত্রাকজনিত রোগ। *Fusarium, Rhizoctonia* ও *Pythium* নামক গণের ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়। অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে চারার গোড়ায় যদি পানি জমে এবং নার্সারি যদি ছায়াযুক্ত স্থানে হয় তাহলে ছত্রাক দ্বার আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বহুগুণে বেড়ে যায়।

লক্ষণ ঃ এ রোগে আক্রান্ত চারার গোড়া পচে যায় এবং প্রথমে বাদামী ও পরে কালো রং ধারণ করে। চারার গোড়া পচে যাওয়ার ফলে গাছ একদিকে হেলে পড়ে। রোগের আক্রমণ বেশি হলে বীজতলার অধিকাংশ চারাই মারা যায়।

বিস্তার ঃ এ রোগের জীবাণু মাটিতে থেকে পরবর্তী মৌসুমেও রোগের বিস্তার ঘটাতে পারে। দীর্ঘ দিন ধরে এ রোগে জীবাণু আক্রান্ত গাছের অবশিষ্টাংশে এবং মাটিতে থাকতে পারে। সচরাচর সেচ বা বৃষ্টির পানির মাধ্যমে এসব জীবাণ স্থানান্তরিত হয়।

অনুকূল অবস্থা ঃ বীজতলার মাটি অধিক স্যাঁতস্যাঁতে হলে আর গরমভাব (২৪° থেকে ৩০° সেন্টিগ্রেড) থাকলে এ রোগে বিস্তার অধিক হয়। আক্রান্ত বীজ ও মাটি দ্বারা এ রোগ বিস্তার লাভ করে।

বিকল্প পোষক ঃ শিম, টমেটো, কপি, বেগুন ও কুমড়া জাতীয় ফসলেও এ রোগ দেখা যায়।

প্রতিকার ঃ যেখানে চারা গাছ লাগানো হবে তার মাটি যেন ভালো থাকে এবং মাটিতে যাতে বায়ু চলাচল করতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বীজতলায় ঘন করে বীজ বোনা যাবে না। দীর্ঘ সময় ছায়া পড়ে এমন জায়গায় বীজতল

করা যাবে না। বীজতলায় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভালো রাখতে হবে যাতে কখনও পানি জমতে বা দাঁড়াতে না পারে। পর্যাপ্ত জৈব সার বীজতলা তৈরির সময় মাটিতে মেশাতে হবে।

বীজতলার মাটি বাণিজ্যিক ফরমালিন দিয়ে শোধন করে নিতে হবে (১ শতক জমির জন্য ৫ লিটার বাণিজ্যিক ফরমালিন মিশ্রণ প্রয়োগ করতে হবে)। এ ছাড়াও সৌরশক্তি বা আগুনের সাহায্যেও শোধন করা যেতে পারে। রোগ দেখা দিলে ডিটাজ্যান্স ২০০ বা রিডোমিল এম জেড ৭২ প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ভালোভাবে গাছের গোড়ায় স্প্রে করতে হবে। আক্রান্ত গাছ বীজতলা হতে তুলে ধ্বংস করতে হবে। *Trichoderma* (ট্রাইকোডারমা) নামক ছত্রাক এ রোগ প্রতিরোধ করতে পারে। চারা রোপনের পূর্বে জমি তৈরির সময় মূল জমির মাটির সাথে *Trichoderma* মিশিয়ে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ১ বিঘা জমির জন্য প্রতি ১০০ কেজি গোবর সার বা কম্পোস্টের সাথে ১ কেজি *Trichoderma* মিশিয়ে ৪ হতে ৫ দিন কালো পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। যখন কম্পোস্টের মধ্যে *Trichoderma* এর সাদা মাইসেলিয়াম তৈরি হবে তখন তা জমি তৈরির সময় মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। বীজতলায় বীজ বপনের আগে প্রতি কেজি বীজের জন্য ৪ গ্রাম হারে কার্বেনডাজিম বা ম্যানকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক দ্বারা বীজ শোধন করে নিতে হবে।

চিত্র ঃ নার্সারিতে ঢলে পড়া রোগের লক্ষণ।

চিত্র ঃ ছত্রাক দ্বারা আক্রান্তের ফলে চারার কান্ডে সৃষ্ট ক্ষত।

২। **পাতায় দাগ পড়া রোগ** ঃ গর্জন, রাবার, বেত, ইউকেলিপটাস, কড়ই, দেবদারু, মহুয়া, শিমুল, নিম ইত্যাদি প্রজাতির চারায় এ রোগ দেখা যায়।

কারণ ঃ *Alternaria*, *Pestalotiopsis* ও *Cercospora* নামক ছত্রাকের আক্রমণের কারণে এ রোগ হয়ে থাকে।

লক্ষণ ঃ এতে চারার পাতায় বাদামী, কালো, লাল ইত্যাদি বর্ণের দাগ দেখা যায়। প্রথমে পাতায় ছোট ছোট বাদামী বর্ণের চক্রাকার দাগ পড়ে। দাগগুলো অসম আকারের হয়। দাগ দেখতে অনেকটা চাক বা পর পর সাজানো কতকগুলো বলয়ের মতো দেখায়। অনেকগুলো দাগ একত্রিত হয়ে পাতার অনেকটা অংশ নষ্ট করে ফেলে। অধিক আক্রমণে পাতা শুকিয়ে যায় এবং ঝরে পড়ে।

বিস্তার ঃ গাছের পরিত্যাক্ত অংশে, বিকল্প পোষক বা আগাছা, বাতাস প্রভৃতির মাধ্যমে এ রোগের জীবাণু বিস্তার লাভ করে।

অনুকূল অবস্থা ঃ মাটিতে পানি ও সারের অভাব দেখা দিলে এ রোগ বেশি দেখা যায়।

বিকল্প পোষক : বেগুন, আলু, টমেটো, শিম, ঢেঁড়স, কপি, পুঁইশাক ইত্যাদি।

প্রতিকার : সুষম সার ও সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। আক্রান্ত পাতা তুলে পুড়ে ফেলতে হবে। রোগের প্রাথমিক অবস্থায় কপার বা কার্বেনডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম মিশিয়ে গাছে ১০-১২ দিন অন্তর অন্তর স্প্রে করতে হবে।

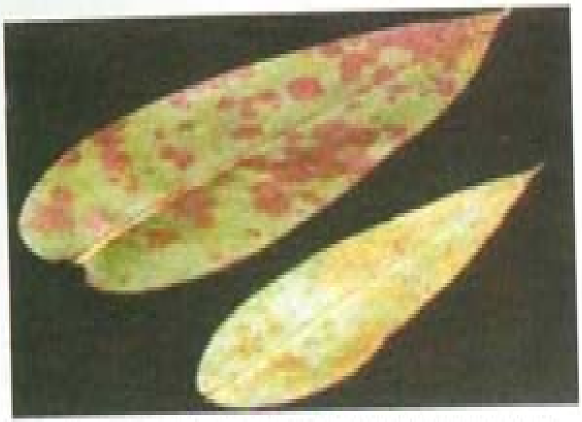

চিত্র : ইউক্যালিপটাস পাতায় দাগ পড়া রোগের লক্ষণ।

চিত্র : বেতের চারায় পাতায় দাগ পড়া রোগ।

৩। **শিকড় পচন রোগ :** ইউক্যালিপটাস, ঝাউ, রাবার, গামার, আকাশমনি, চম্পা, সেগুন, লোহাকাঠ, সুন্দরী ইত্যাদি প্রজাতির চারায় এ রোগ দেখা যায়।

কারণ : *Fusarium, Rhizoctonia* ও *Sclerotium* নামক ছত্রাকের আক্রমণের কারণে এ রোগ দেখা দেয়।

লক্ষণ : প্রথমে চারার প্রধান শিকড় আক্রান্ত হয় এবং পচতে শুরু করে। পরবর্তীতে চারার গোড়ার মাটির কাছাকাছি স্থানে পচে যায়। চারার প্রধান শিকড় পচে নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে গাছের পাতা বিবর্ণ হয়ে ঝরতে শুরু করে। এক সময় সম্পূর্ণ চারা মরে যায়।

বিস্তার : আক্রান্ত গাছের অবশিষ্টাংশের মাধ্যমে এ রোগের জীবাণু অনেক বছর বেঁচে থাকতে পারে। এমনকি এরূপ গাছ আবর্জনা হিসেবে জৈব সার উৎপাদনে ব্যবহার করলেও সে সার মাটিতে প্রয়োগ করলে গাছের চারায় এ রোগ হতে পারে। আক্রান্ত বীজ ও মাটির সাহায্যেও এ রোগ বিস্তার হতে পারে। সেচের পানির মাধ্যমেও এ রোগ বিস্তার লাভ করতে পারে।

অনুকূল অবস্থা : আবহাওয়া শুষ্ক ও গরম হলে এ রোগ বৃদ্ধি পায়।

বিকল্প পোষক : আক্রান্ত গাছের অবশিষ্টাংশে।

প্রতিকার : আক্রান্ত চারা তুলে পুড়ে ফেলতে হবে। চারা বপনের পূর্বে নার্সারির মাটি বাণিজ্যিক ফরমালিন দিয়ে শোধন করে নিতে হবে। রোগ দেখা দিলে ম্যানকোজেব বা কার্বেনডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ভালোভাবে গাছের গোড়ায় স্প্রে করতে হবে। এছাড়াও বীজ বপনের পূর্বে উপরোক্ত ছত্রাকনাশক দিয়ে বীজ শোধন করেও এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়। *Trichoderma* নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়। চারা রোপনের পূর্বে জমি তৈরির সময় মূল জমির মাটির সাথে *Trichoderma* মিশিয়ে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

চিত্র ঃ ঝাউ গাছের শিকড় পচন রোগের লক্ষণ।

চিত্র ঃ নার্সারিতে সুস্থ সবল রাবার চারা।

চিত্র ঃ শিকড় পচন রোগে আক্রান্ত রাবার চারা।

৪। গোড়া পচা বা কাণ্ড পচা রোগ ঃ পলাশ, কড়ই, সেগুন, শাল, গামার, পাইন, পাম ইত্যাদি প্রজাতির চারায় এ রোগ দেখা যায়।

কারণ ঃ *Fusarium, Rhizoctonia* ও *Sclerotium* নামক ছত্রাক এ রোগের জন্য দায়ী।

লক্ষণ ঃ বাড়ন্ত চারার মাটির সমতলের ঠিক নিচে মাটি সংলগ্ন কাণ্ডের অংশে প্রথমে হলুদাভাব ও পরে বাদামি দাগ দেখা যায়। নিচের দিকের পাতা প্রথমে ও পরে ধীরে ধীরে উপরের দিকের পাতা হলদে হয়ে যায়। এতে গাছ ঢলে পড়ে ও মারা যায়।

বিস্তার ঃ এ রোগ মাটি, বীজ ও আক্রান্ত গাছের অবশিষ্টাংশের মাধ্যমে ছড়াতে পারে।

অনুকূল অবস্থা ঃ মাটি ভেজা থাকলে এ ছত্রাক মাটির উপরিভাগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং আশেপাশের গাছকে আক্রমণ করে। এ রোগ মাটি ও আক্রান্ত চারার মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে।

বিকল্প পোষক ঃ আলু, বেগুন, কুমড়া, টমেটো ইত্যাদি।

প্রতিকার ঃ সুস্থ ও সবল বীজ রোপন করা উচিত। বীজতলায় ভালোভাবে পচানো শুকনো জৈব সার দিতে হবে। বীজ বপনের আগে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক দিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে। বীজতলার মাটি বাণিজ্যিক ফরমালিন দিয়ে শোধন করে নিতে হবে । বীজ তলায় যাতে পানি না জমে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে। বিশেষ করে অতিরিক্ত মাত্রায় ইউরিয়া সার প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে। আক্রান্ত চারা ও এর আশেপাশের মাটিসহ তুলে দূরে কোথাও পুতে ফেলতে হবে। রোগ দেখা দিলে কপার অক্সিক্লোরাইড অথবা ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক ৭ দিন পর পর ২ থেকে ৩ বার স্প্রে করতে হবে। চারা রোপনের পূর্বে জমি তৈরির সময় মূল জমির মাটির সাথে *Trichoderma* মিশিয়ে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

চিত্র ঃ নার্সারিতে কাণ্ড পচন রোগের লক্ষণ।

চিত্র ঃ নিম চারার কাণ্ড পচন রোগের লক্ষণ।

চিত্র ঃ পাম চারার কাণ্ড পচন রোগের লক্ষণ।

৫। **পাউডারী মিলডিউ রোগ** : শিশু, রাবার, আকাশমনি, কড়ই, তুলসি ইত্যাদি প্রজাতির চারায় এ রোগ দেখা যায়।

কারণ : *Oidium, Phytophthora* ও *Erysiphe* নামক ছত্রাকের আক্রমণের কারণে এ রোগ হয়ে থাকে। সচরাচর শীতকালে এ ছত্রাকের আক্রমণের হার বেশি পরিলক্ষিত হয়।

লক্ষণ : আক্রান্ত পাতায় এবং গাছের গায়ে সাদা সাদা পাউডারের মত দাগ দেখা যায়, যা ধীরে ধীরে সমস্ত পাতায় ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে পাতা কুঁচকে যায় এবং পাতার সবুজ রং নষ্ট হয়ে যায়। আক্রান্ত বেশি হলে পাতা হলুদ বা কালো হয়ে মারা যায়। একসময় আক্রান্ত পাতা ঝড়ে পড়ে। এতে গাছের বৃদ্ধি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়।

বিস্তার : শীতের সময় এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি লক্ষ্য করা যায়।

অনুকূল অবস্থা : আক্রান্ত গাছ থেকে অনুকূল আবহাওয়ায় বাতাসের মাধ্যমে অতি দ্রুত এ রোগ বিস্তার লাভ করে। উচ্চ আর্দ্রতাযুক্ত আবহাওয়া ও রাতে নিম্ন তাপমাত্রা এ রোগ বিস্তারে সহায়ক।

বিকল্প পোষক : কুমড়া, শসা, পটল, তরমুজ ইত্যাদি সবজি জাতীয় উদ্ভিদ।

প্রতিকার : আক্রান্ত গাছের আক্রান্ত ও পরিত্যাক্ত অংশ সংগ্রহ করে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। সালফার বা কার্বেনডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর আক্রমণের শুরু থেকে মোট ২-৩ বার প্রয়োগ করতে হবে। সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে। ছত্রাকনাশক স্প্রে করার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। পাউডারি মিলডিউ রোগ দমনের জন্য থিয়োভিট ৮০ ডব্লিউজি কার্যকরী ও অনুমোদিত। থিয়োভিট ৮০ ডব্লিউজি প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে। এ ভাবে ১০ দিন পর পর মাসে ২-৩ বার প্রয়োগ করতে হবে।

চিত্র : পাউডারি মিলডিউ রোগে আক্রান্ত তুলসি পাতা।

চিত্র : পাউডারি মিলডিউ রোগে আক্রান্ত আকাশমনি চারা।

৬। **মোজাইক রোগ** : পাম, পাইন, কাসাভা ইত্যাদি প্রজাতির চারায় এ রোগ দেখা যায়।

কারণ : ভাইরাস দ্বারা এ রোগ সংঘটিত হয়।

লক্ষণ : চারা অবস্থায় আক্রান্ত চারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। পাতাগুলো খর্বাকৃতি, নিচের দিকে কোঁকড়ানো, বিকৃত, বিবর্ণ রং ধারণ করে গুটিয়ে যায়। গাছে ফুল, ফল ধারণ করতে পারে না। বড় গাছ এ রোগে আক্রান্ত হলে প্রথমে ডগার মাথার কচি পাতায় হলুদ, সবুজ ও মোজাইক রং ধারণ করে এবং কুঁচকে যায়, গাছ খাটো হয়ে যায়, ফলে পাতা ও গাছ আয়তনে ছোট হয়ে আসে। আক্রান্ত গাছের কাণ্ডে ও ফলেও নানা বর্ণের দাগ দেখা দেয়। রোগটি খুবই ছোঁয়াচে।

বিস্তার : সচরাচর জাব পোকা দ্বারা এ রোগ ছড়ায়। রোগাক্রান্ত গাছ হতে বীজ সংগ্রহ করলে বীজের মাধ্যমে রোগ ছড়াতে পারে।

অনুকূল অবস্থা ঃ নার্সারিতে জাব পোকার উপস্থিতি থাকলে এ রোগ বেড়ে যায়। জাব পোকা আক্রান্ত গাছ থেকে রস চুষে খাওয়ার পর সুস্থ গাছে খাওয়া শুরু করলে সে গাছেও এ রোগের জীবাণু অনুপ্রবেশ করে ও রোগ সৃষ্টি করে।

বিকল্প পোষক ঃ তামাক, আলু, বেগুন, মরিচ, শসা, ধুতুরা প্রভৃতি গাছেও এ রোগ দেখা যায়।

প্রতিকার ঃ মোজাইক অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ। সুস্থ গাছের সঙ্গে রোগাক্রান্ত গাছের সামান্য ছোঁয়া লাগলেই তাতে রোগ হতে পারে। নার্সারিতে কাজ করার সময় নানাবিধ যন্ত্রপাতি এবং শরীরের ছোঁয়া লেগে রোগ এক গাছ হতে অন্য গাছে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক সময় জাব পোকা রোগ বিস্তারে সাহায্য করে। মোজাইক রোগের ভাইরাস শুষ্ক পাতা, কাণ্ড ও ফসলের পরিত্যক্ত অংশে বেশ কয়েক বছর বেঁচে থাকতে পারে। এ ছাড়া মোজাইক ভাইরাস অন্যান্য গাছে (যথা- আলু, বেগুন, মরিচ, শসা, তামাক প্রভৃতি) আশ্রয় গ্রহণ করে বেঁচে থাকে এবং রোগ সংক্রমণে সাহায্য করে। মোজাইক রোগ দমনের জন্য গাছে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া মাত্রই তা তুলে নষ্ট করা উচিত। নার্সারিতে কাজ করার সময় প্রথম সুস্থ গাছ নিয়ে কাজ করা উচিত। কারণ, রোগাক্রান্ত গাছকে স্পর্শ করার পর সুস্থ গাছকে স্পর্শ করলে রোগ সুস্থ গাছে সংক্রমিত হতে পারে। নার্সারি যথাসম্ভব পরিষ্কার রাখা উচিত। জাব পোকার আবির্ভাবে উপযুক্ত কীটনাশক ছিটিয়ে তা দমন করতে হবে। আক্রান্ত গাছের বীজ ধ্বংস করে ফেলতে হবে। রোগাক্রান্ত গাছ হতে কোন বীজ সংগ্রহ করা ও ব্যবহার করা যাবে না।

চিত্র ঃ কাসাভা গাছের মোজাইক রোগ।

চিত্র ঃ পান পাতার মোজাইক রোগ।

৭। এনথ্রাকনোজ রোগ ঃ রাবার, কাঁঠাল, আম, পেয়ারা, ঘৃতকুমারী ইত্যাদি প্রজাতির চারায় এ রোগ দেখা যায়।

কারণ ঃ *Colletotrichum* নামক গণের বিভিন্ন প্রজাতির ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়।

লক্ষণ ঃ মাটির উপরে গাছের যে কোন অংশই এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। পুরাতন পাতা অথবা যে সব পাতা কিছুটা পুরাতন হয়েছে এমন ধরনের পাতায় ঈষৎ সবুজ রঙের দাগ পড়ে। এ দাগের রঙ শীঘ্রই বাদামী হয়ে যায়। আর্দ্র আবহাওয়ায় আক্রান্ত অংশসমূহে কালো কালো বিন্দুর ন্যায় এক প্রকার ছত্রাক অঙ্গ উৎপন্ন হয়। এই বিন্দুগুলিকে এসারভুলি বলে। এ রোগ পাতার আগায় এবং কিনারায় বেশি হয়। আক্রান্ত পাতা ও ডাল আগা হতে শুরু করে নিচের দিকে আস্তে আস্তে শুকাতে থাকে। ডাল শুকাবার সঙ্গে সঙ্গে পাতা ঝরে পড়ে এবং মাঝে মাঝে পাতা ঝরে পড়ার আগেই ডাল শুকিয়ে যায়। এ কারণে আক্রান্ত গাছে অসংখ্য পত্রবিহীন মরা, অর্ধমৃত অথবা রোগাটে ডাল পাওয়া যায়। রোগের প্রকোপ বেশি হলে বড় ডালগুলিও রোগাক্রান্ত হয়ে যায় এবং হলুদ বর্ণ ধারণ করে। আস্তে আস্তে আক্রান্ত ডালের পাতা ঝরে পড়ে এবং শুকিয়ে যায়।

বিস্তার ঃ এ রোগের জীবাণু মাটি ও বীজের মাধ্যমে ছড়ায়। কুমড়া জাতীয় উদ্ভিদ এ রোগ জীবাণুর আশ্রয়দাতা। এ রোগের জীবাণু পানির মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে পারে। কিছু বিটল জাতীয় পোকা এ রোগ জীবাণুর বাহক হিসেবেও কাজ করে। আবহাওয়া অধিক ভেজা ও ২০°-৩০° সে. তাপমাত্রা বিরাজ করলে এ রোগ বেশি হয়।

অনুকূল অবস্থা ঃ এ ছত্রাক জীবাণু মূলত মাটি ও বীজবাহিত। বন্য ও অন্যান্য কুমড়া গোত্রীয় আগাছা এ রোগ জীবাণুর আশ্রয়দাতা। ২২°-২৭° সে. তাপমাত্রায় এ ছত্রাক জীবাণুর বৃদ্ধি বেশি ঘটে। এ রোগের জীবাণু পানি, বৃষ্টি, ঝরণার পানি ইত্যাদির মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে পারে। কিছু বিটল জাতীয় পোকা এ জীবাণুর বাহক হিসেবে কাজ করে। আবহাওয়া অধিক ভেজা ও ২০°-৩০° সে. তাপমাত্রা বিরাজ করলে এ রোগ বেশি হয়।

বিকল্প পোষক ঃ মরিচ, পেঁপে, তরমুজ ইত্যাদি।

প্রতিকার ঃ চারা যখন বড় হতে থাকে তখন তাকে রোগমুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে জানুয়ারি মাসে একবার ও সেপ্টেম্বর মাসে একবার ২% বোর্দোমিশ্রচার গাছে ছিটাতে হবে। প্রয়োজনীয় খাদ্যাভাবের অভাবে গাছ যাতে দুর্বল না হয়ে পড়ে তার জন্য শিকড়ের চারপার্শ্বে উপযুক্ত সার ও নিয়মিত পানি দিতে হবে। মাটিতে ক্ষার বেশি থাকলে প্রত্যেক গাছের গোড়ায় জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে। আক্রান্ত অংশ ছেটে ফেলতে হবে। ছাটা অংশগুলি সাবধানে সংগ্রহ করে মাটির নিচে চাপা দেওয়া অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। ডাল ছাটা এর পর পরই আলকাতরা কিংবা অন্য কোন রঙ লাগিয়ে কাটা অংশটি ঢেকে দিতে হবে। নতুবা কাটা অংশের ক্ষত দিয়ে জীবাণু গাছের দেহে প্রবেশ করে রোগ সৃষ্টি করতে পারে। বীজ বপনের পূর্বে প্রতি কেজি বীজের সাথে ৪ গ্রাম কার্বেনডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক দ্বারা বীজ শোধন পূর্বক বীজ বপন করলে গাছে রোগের আক্রমণ হয় না। গাছে দুটি পাতা বের হওয়ার পর হতে ১০ দিন পর পর নিয়মিতভাবে ডায়াথেন এম-৪৫ (২ গ্রাম/লিটার) স্প্রে করে রোগ নিরাময় করা যায়।

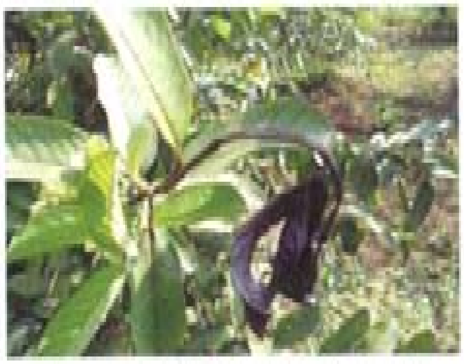

চিত্র ঃ পেয়ারা গাছের এনথ্রাকনোজ রোগ।

চিত্র ঃ ঘৃতকুমারী গাছের এনথ্রাকনোজ রোগ।

৮। **ক্যাংকার রোগ ঃ** ঝাউ, কড়ই, সেগুন, মেহগনি, সুন্দরী, ইউক্যালিপ্টাস ইত্যাদি প্রজাতি।

কারণ ঃ ব্যাকটেরিয়া অথবা ছত্রাকের কারণে হয়।

লক্ষণ ঃ প্রাথমিক অবস্থায় বাড়ন্ত সবুজ সতেজ কচি পাতায় প্রথমে হালকা হলুদ রঙের দাগ পড়ে। দাগগুলি পাতার উভয় পার্শ্বেই ছড়িয়ে পড়ে। তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাতার উল্টা পৃষ্ঠে দাগ বেশি হয়। রোগাক্রমণের কয়েক দিনের মধ্যে আক্রান্ত স্থানের তন্তু ঈষৎ সাদা রঙের ফোস্কার মতো উঁচু হয়ে বের হয়ে আসে। ফোস্কার উপরিভাগে মাঝে মাঝে মসৃণ থাকে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফেটে যায়। রোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত অংশের তন্তুর রঙ প্রথমে সাদা এবং পরে বাদামী হয়ে যায়। ক্রমে ক্রমে দাগগুলি সংখ্যায় ও আয়তনে বেড়ে পাতার অধিকাংশ স্থান দখল করে। অবশেষে দাগের মাথায় তন্তু মরে যায় এবং মাঝে মাঝে এ মৃত অংশ শুকিয়ে খসে পড়ে। এর ফলে পাতায় ছোট ছোট ছিদ্র হয়। বাড়ন্ত পাতায় ৩ সপ্তাহের মধ্যে দাগের ব্যাস ৩ হতে ৪ মিলিমিটার হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য মূলক দাগগুলির চারদিকে হলুদ বর্ণের তন্তু দ্বারা বেষ্টিত থাকে। কচি ডালে এবং কান্ডেও এ রোগ দেখা দেয়।

বিস্তার ঃ এ রোগের জীবাণু মাটিতে ৮-১০ দিন বেঁচে থাকতে পারে। আলো বা রোদে তা দ্রুত ধ্বংস হয়। গাছের মাটির নিচের অংশ ব্যতীত বাকি সকল অংশে এই রোগ আক্রমণ করে। সাধারণত গাছের ক্ষত অংশ এবং পত্ররন্ধ্র দ্বারা জীবাণু গাছের ভিতরে প্রবেশ করে। তাই বর্ষাকালে অধিক বাতাসে গাছে ক্ষত সৃষ্টি হলে জীবাণু দ্বারা আক্রমণের ঝুঁকি বেশি থাকে। বীজের মাধ্যমেও এ রোগ ছড়ায়।

অনুকূল অবস্থা ঃ অধিক তাপমাত্রা ও মাটির অধিক আর্দ্রতা এ রোগ বৃদ্ধির জন্য অনুকূল।

বিকল্প পোষক ঃ লেবু, সজিনা ও সয়াবিন জাতীয় উদ্ভিদ।

প্রতিকার ঃ প্রাথমিকভাবে রোগ নির্ণয় এবং সময় মতো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করলে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। নার্সারিতে এ রোগ দেখা গেলে রোগাক্রান্ত গাছ পুড়িয়ে সমূলে বিনষ্ট করতে হবে। নার্সারিতে প্রবেশ করার আগে যাবতীয় পোষাক-পরিচ্ছদ ও যন্ত্রপাতি জীবাণু নাশক ঔষধে শোধন করে নিতে হবে। শীতের সময় শুষ্ক আবহাওয়ায় রোগ- জীবাণুর আক্রমণ ক্ষমতা কমে আসে। সে জন্য ঐ সময়ে পরিমিত সার প্রদান ও সেচের দ্বারা গাছকে সতেজ করে তুলতে পারলে গাছে যে সকল নতুন নতুন পাতা ও ডাল বের হয় তাতে রোগের আক্রমণ কম হয়। ঐ সময় গাছের আক্রান্ত অংশসমূহ যথাসম্ভব ছেটে ফেলতে হয়। এ রোগ থেকে মুক্তি পেতে হলে সুস্থ সবল ও নীরোগ বীজ ব্যবহার করতে হবে। রোগ যদি ছত্রাক ঘটিত হয় সেক্ষেত্রে গাছে রোগের লক্ষণ দেখামাত্র ২% বোর্দোমিক্সার ১ সপ্তাহ অন্তর অন্তর ছিটাতে হবে। গাছের নিচে ঝরে পড়া পাতা ও ফল সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে চিলিটেড জিংক স্প্রে করলে রোগের তীব্রতা কমে যায়। রোগ ব্যাকটেরিয়া ঘটিত হলে ট্রাই ব্যাসিক কপার সালফেট গ্রুপের ঔষধ (যেমন- কিউপ্রোক্সেট ৩৪৫ এসসি) প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি হারে মিশিয়ে ৭ দিন পর পর ২-৩ বার গাছে স্প্রে করতে হবে। ফিউপিরোসিন গ্রুপের ব্যাকটেরিয়ানাশক (যেমন-ব্যাকটোবান) ১ লিটার পানিতে ৪ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৭ দিন পর পর ২-৩ বার গাছে স্প্রে করতে হবে। ব্যাকটোবান ও কিউপ্রোক্সেট ৩৪৫ এসসি ঔষধ দুইটি পর্যায়ক্রমে একটা ব্যবহার করার পর আর একটি ব্যবহার করতে হবে।

চিত্র ঃ ঝাউ গাছের ক্যাংকার রোগের লক্ষণ।

চিত্র ঃ কড়ই গাছের ক্যাংকার রোগের লক্ষণ।

৯। আঠা ঝরা (গামোসিস) রোগ ঃ নিম, আম, লেবু, গামার, রাবার, শিশু, কড়ই ইত্যাদি প্রজাতির গাছে এ রোগ দেখা যায়।

কারণ ঃ *Phytophthora* এবং *Lasiodiplodia theobromae* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে।

লক্ষণ ঃ প্রাথমিক অবস্থায় কাণ্ডের গোড়ার দিকে বড় বড় পানি ভেজা দাগ দেখা যায়। শীঘ্রই এই দাগগুলি বাদামী বর্ণ ধারণ করে এবং কাণ্ডের বাকলে ফাটল দেখা দেয়। এ ফাটল দ্বারা ভিতর হতে আঠা বের হয়ে আসে। রোগ কাণ্ডের উপরের দিকে শাখা এবং নিচের দিকে শিকড় পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। অনেক সময় রোগের লক্ষণ কাণ্ডের গোড়ার দিকে সীমাবদ্ধ থাকে কিন্তু রোগের জীবাণু কাণ্ডের ভিতরে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে থাকে। রোগ আরও বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপরের

শাখা-প্রশাখা হতে আঠা ঝরতে থাকে। আক্রান্ত গাছের পাতা ধীরে ধীরে হলুদ হয়ে যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে গাছ মরে যায়। এতে গাছের বৃদ্ধি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয় এবং কাঠের গুণগত মান কমে যায়।

বিস্তার : ছত্রাক মাটিতে বেঁচে থাকে এবং গাছের গোড়ায় আক্রমণ করে। ছত্রাক আক্রান্ত অংশে স্পোর উৎপন্ন করে। এ সমস্ত স্পোর সেচের পানি দ্বারা এক গাছ থেকে অন্য গাছে বিস্তার লাভ করে। যদি গাছের কাণ্ড বেশি দিন পানির সংস্পর্শে থাকে তবে এ রোগ হতে দেখা যায়। বীজের মাধ্যমেও এ রোগ ছড়াতে পারে।

অনুকূল অবস্থা : অধিক তাপমাত্রা ও মাটিতে অধিক পরিমাণে আর্দ্রতা এ রোগ বিস্তারে সহায়ক।

বিকল্প পোষক : লেবু, আম, সজিনা ইত্যাদি।

প্রতিকার : আক্রান্ত অংশে ভালভাবে চেঁছে বোর্দো পেস্ট লাগাতে হবে। সুস্থ সবল নীরোগ গাছ হতে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।

চিত্র : শিশু গাছের গামোসিস বা আঠা ঝরা রোগের লক্ষণ।

চিত্র : নিম এর গামোসিস রোগের লক্ষণ।

১০। পাতা ঝলসানো রোগ : সেগুন, রাবার, ইউক্যালিপ্টাস, বেত, অশ্বগন্ধা, পাম অয়েল ইত্যাদি প্রজাতির গাছে এ রোগ দেখা যায়।

কারণ : *Alternaria, Aulographina, Cercospora, Drechslera, Rhizoctonia* ও *Scytalidium* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে।

লক্ষণ : আক্রান্ত পাতায় প্রথমে ছোট, আঁকাবাঁকা ও লালচে-বাদামী রঙের দাগ দেখা দেয়। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দাগগুলি গোলাকৃতির হয়। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দাগের মধ্যভাগ ধূসর ও ধার কালো হয়ে আসে। অনেক সময় সবচেয়ে বয়স্ক দাগের মধ্যভাগ খসে পড়ে এবং পাতার গায়ে ছিদ্রের সৃষ্টি হয়। গাছ খুব বেশি আক্রান্ত হলে পাতা শুকিয়ে মারা যায় ও আগুনে পোড়া ঝলসানো এর মতো মনে হয় এবং ঝরে পড়ে।

বিস্তার : গাছের পরিত্যক্ত অংশে, বিকল্প পোষক বা আগাছা, বাতাস ও বীজের মাধ্যমে এ রোগের জীবাণু বিস্তার লাভ করতে পারে।

অনুকূল অবস্থা : জমিতে পানি ও সারের অভাব হলে এ রোগ বেড়ে যায়।

বিকল্প পোষক : আলু, মরিচ, টমেটো, ঢেঁড়স, চীনাবাদাম ইত্যাদি।

প্রতিকার : রোগ দমনের জন্য সুস্থ ও নীরোগ বীজ ব্যবহার করতে হবে। রোগের প্রারম্ভে কপার বা কার্বেনডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক ১ লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৭ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।

কীট-পতঙ্গের পরিচিতি, গঠন, শ্রেণিবিন্যাস ও বাস্তুতন্ত্র

কীট-পতঙ্গের পরিচিতি

কীট-পতঙ্গ প্রাণিজগতের আর্থ্রোপোডা পর্বের অন্তর্ভুক্ত ইনসেক্টা (Insecta) শ্রেণির অন্তর্গত প্রাণি। এদের দেহ ৩ টি প্রধান খণ্ডে বিভক্ত। যথা: মাথা, বক্ষ ও উদর (Head, Thorax and Abdomen)। এদের মাথায় ১ জোড়া পুঞ্জাক্ষী ও ১ জোড়া এন্টেনা থাকে। এন্টেনা একটি স্পর্শকাতর অঙ্গ। কীটপতঙ্গের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, এদের ৩ জোড়া বা ৬টি পা আছে। এদের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ১ বা ২ জোড়া পাখা আছে। সুতরাং যেসব সন্ধিপদী প্রাণীদের দেহ মস্তক, বক্ষ ও উদরে বিভক্ত, মস্তকে ১ জোড়া অ্যান্টিনা এবং বক্ষ ২ জোড়া ডানা যুক্ত, তারাই পতঙ্গ। প্রাণিজগতের ৭০% হতে ৮০% হচ্ছে কীট-পতঙ্গ। এ পর্যন্ত প্রায় ১০ লক্ষ পতঙ্গ প্রজাতি বর্ণিত হয়েছে। এখনও অনেক পতঙ্গ প্রজাতি মানুষের অজানা রয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। পৃথিবীর সর্বত্র এদের অবস্থান। পোকা মাকড় বিশেষজ্ঞগণ কীটপতঙ্গকে প্রায় ২৮টি বর্গে ভাগ করেছেন। এর মধ্যে লেপিডোপটেরা (Lepidoptera), কলিওপটেরা (Coleoptera), অর্থোপটেরা (Orthoptera), হেমিপটেরা (Hemiptera), হোমোপটেরা (Homoptera), হাইমেনপটেরা (Hymenoptera), আইসোপটেরা (Isoptera) ও ডিপটেরা (Diptera) কৃষি ও বনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই বর্গের পোকা নার্সারি ও অন্যান্য উদ্ভিদের বেশি ক্ষতি করে থাকে।

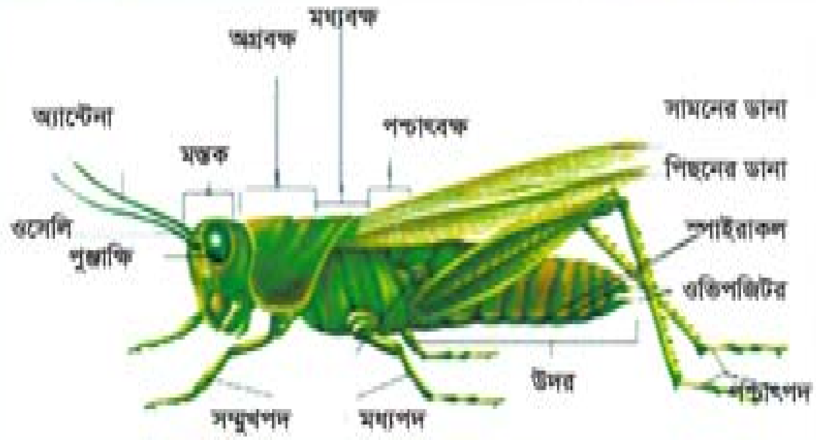

চিত্র ঃ একটি পোকার শরীরের বিভিন্ন অংশ।

কীট-পতঙ্গের জীবন চক্র

কীট-পতঙ্গের জীবনকাল সংক্ষিপ্ত। অধিকাংশ পোকা ১ বা ২ মাসের মধ্যে জীবন চক্র সম্পন্ন করে। স্ত্রী পোকা ডিম পাড়ে, ডিম ফুটে বিভিন্ন ধাপে পূর্ণাঙ্গ পোকায় পরিণত হয়। সাধারণত ৪টি ধাপে পোকার জীবনচক্র সাধিত হয়। যেমন: ডিম, শুককীট, মুককীট ও পূর্ণাঙ্গ পোকা। অধিকাংশে পোকা শুককীট অবস্থায় গাছের বেশি ক্ষতি করে থাকে। মুককীট অবস্থায় পোকা গাছের জন্য ক্ষতিকারক নয়। অনেক পোকা পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় গাছের ও বৃক্ষ সম্পদের ক্ষতি করে থাকে।

কীট-পতঙ্গের আক্রমণ ও ক্ষতির ধরণ

নার্সারির চারা গাছের জন্য কীট-পতঙ্গ অর্থাৎ পোকার আক্রমণ খুবই ভয়াবহ হতে পারে। কোন কোন সময় নার্সারি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হতে পারে। কীট-পতঙ্গ বিভিন্ন ভাবে আমাদের ক্ষতি করতে পারে। যেমন- গাছের পতা, শীর্ষ মুকুল, কক্ষ মুকুল, কাণ্ডের নরম অংশে, বীজের শ্বাস ও মূলের অংশ খেয়ে বিনষ্ট করে। অনেক কীট-পতঙ্গ গাছের রস চুষে খায়। অনেক কীট-পতঙ্গ মাটিতে থাকে এবং গাছের শিকড় ও প্রধান মূল কেটে ফেলে।

পতঙ্গের স্বভাব ও বাসস্থান

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই পতঙ্গের বসবাস। তবে উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে পতঙ্গের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। ৯ হাজার মিটার উচ্চতায়, যেখানে গিরিশৃঙ্গ সর্বদাই তুষার আবৃত থাকে, অন্য কোন জীবিত প্রাণীর দেখা পাওয়া প্রায় অসম্ভব, সেখানেও কিছু প্রজাতির পতঙ্গ জীবনযাত্রা নির্বাহ করে এবং সে কারণেই এদের প্রজাতি সংখ্যা যেমন বেশি তেমনি এদের সম্মিলিত সংখ্যাও অধিক।

পতঙ্গের স্বভাব এবং বাসস্থান বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। বিভিন্ন বাস্তুতান্ত্রিক পরিবেশে পতঙ্গ বিভিন্নভাবে অভিযোজিত হয়েছে। বিভিন্ন পরিবেশে জীবনধারনে সক্ষম হওয়ায় এদের স্বভাবগত তারতম্য দৃষ্টিগোচর হয়। এই কারণে বাস্তুতন্ত্রে মানুষের স্বার্থের অনুকূলে এবং প্রতিকূলে উভয় প্রকার সম্পর্ক স্থাপিত হতে দেখা যায়। পতঙ্গের পরাগায়ন ছাড়া যেমন ফসলের উৎপাদন কমে যায় তেমনি এদের তৈরি রেশম, মোম, গালা ইত্যাদি আমাদের নিত্যদিনের ব্যবহার্য পণ্য। পাশাপাশি আপদ হিসেবে কৃষি ও বনের ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতি, ভেক্টর হিসেবে রোগ বিস্তার এবং সরাসরি পরজীবি হিসেবে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে মানুষকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করে। সুতরাং জীবন যাপনের এই ভিন্নতার কারণে বাস্তুতন্ত্রে এদের অবস্থা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

ক) মিঠা পানির পতঙ্গ (Fresh water insect) - স্থির পানির পতঙ্গ (Lentic water insect), প্রবাহমান পানির পতঙ্গ (Lotic water insect)।

খ) সিমবায়োটিক পতঙ্গ (Symbiotic insect)

গ) স্থলচর পতঙ্গ (Terrestrial insect)- ভূমিবাসী পতঙ্গ (Ground living insect), গর্তবাসী পতঙ্গ (Fossarial insect), বৃক্ষবাসী পতঙ্গ (Arboreal insect), পচা পাতার স্তূপ বা লিটার নিবাসী পতঙ্গ (Litter living), উষর অঞ্চলের নিবাসী (Arid zone dwellers), পাহাড়ী অঞ্চলের পতঙ্গ (Altitudinal insect), খেচর পতঙ্গ (Volant insect)।

ঘ) পরজীবি পতঙ্গ (Parasitic insect)

এছাড়াও উদ্ভিদ ও অন্যান্য পতঙ্গের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কের আলোকে পতঙ্গের স্বভাব ও বাসস্থানের আরও ভিন্ন মাত্রা দেখা যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কীটনাশক/আপদনাশকের প্রকারভেদ, ফরমুলেশন ও ব্যবহার পদ্ধতি

আপদনাশক

যে সকল পদার্থ বা বস্তু আপদ ধ্বংস করতে সক্ষম, তাই আপদনাশক। বাজারে বিভিন্ন প্রকার আপদনাশক পাওয়া যায়।

আপদনাশকের প্রকারভেদ

- **কীটনাশক :** পোকা ধ্বংসের জন্য।
- **ছত্রাকনাশক :** ছত্রাক ধ্বংসের জন্য।
- **আগাছানাশক :** আগাছা ধ্বংসের জন্য।
- **মাকড়নাশক :** মাকড় ধ্বংসের জন্য।
- **ইঁদুরনাশক :** ইঁদুর ধ্বংসের জন্য।
- **কৃমিনাশক :** কৃমি ধ্বংসের জন্য।
- **শামুকনাশক :** শামুক ধ্বংসের জন্য।

আপদনাশক ফরমুলেশন

- সক্রিয় উপাদান সচরাচর সরাসরি ব্যবহার করা যায় না।
- কৃষকের ব্যবহারোপযোগী যে অবস্থায় সক্রিয় উপাদান পাওয়া যায়, সেটিই ফরমুলেশন।
- একই আপদনাশক বিভিন্ন ফরমুলেশনে বাজারজাত করা হয়।

ফরমুলেশনের প্রকারভেদ

- **গুঁড়া :** শুষ্ক ব্যবহারের জন্য।
- **পানিতে দ্রবণীয় গুঁড়া :** পানিতে ভিজিয়ে ব্যবহারের জন্য।
- **দানাদার :** সারের মত ব্যবহারের জন্য।
- **ইমালশান :** তৈলাক্ত আপদনাশক পানিতে মিশিয়ে ব্যবহারের জন্য।
- **এরোসল :** তরল গ্যাসের সাথে চাপযুক্ত কৌটায় ব্যবহারের জন্য।
- **ধুম্র :** বাতাসের সংস্পর্শে এনে বিষাক্ত ধুঁয়া হিসেবে ব্যবহারের জন্য।

কীটনাশক নির্বাচন ও প্রকারভেদ

পোকা আক্রমণের অবস্থা দেখে সঠিক কীটনাশক প্রয়োগ করা অত্যন্ত জরুরী। কীটনাশকের কার্যকারিতার উপর ভিত্তি করে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন-পাকস্থলী বিষ, স্পর্শকাতর বিষ, ধুমায়িত বিষ, বিকর্ষক বিষ ও অন্তর্বাহী বিষ।

ক) পাকস্থলী বিষ

এই জাতীয় বিষ গাছের পাতার মাধ্যমে খাদ্য হিসাবে কীট-পতঙ্গের পাকস্থলীতে প্রবেশ করে এবং বিষক্রিয়ার মাধ্যমে পোকা মরে যায়। পাতা ভক্ষণকারী পোকা, যেমন- প্রজাপতি ও মথের শুককীট, বিটল এবং ফড়িং জাতীয় পোকা দমনের জন্য পাকস্থলী বিষ কার্যকর। ম্যালাথিয়ন, লিবাসিড, ডায়াজিনন, সুমিথিয়ন, রিপকর্ড, সেভিন ও সাইথ্রিন এই জাতীয় বিষ।

খ) স্পর্শকাতর বিষ

এই জাতীয় বিষ পোকার শরীরে লেগে শ্বাসনালীর মাধ্যমে দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে বিষক্রিয়া ঘটায়। পাতাভোজী পোকা, শোষক পোকা ও থ্রিপস ইত্যাদি দমনের জন্য এই বিষ ব্যবহৃত হয়। রিপকর্ড, সিমবুস, ডায়াজিনন, সুমিথিয়ন ও সাইথ্রিন এই জাতীয় বিষ।

গ) ধূমায়িত বিষ

এই জাতীয় কীটনাশক হতে ধূঁয়ার আকারে বিষ নির্গত হয় এবং পোকার শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে বিষক্রিয়া ঘটায়। নগস, ফেপনা, ডিডিপিপি ও মিথাইল ব্রোমাইড এই জাতীয় বিষ। মাটির পোকা ও বীজের পোকা দমনে এই কীটনাশক উপযোগী।

ঘ) অন্তর্বাহী বিষ

এই জাতীয় কীটনাশক গাছের পাতা, কাণ্ড ও মূলের মাধ্যমে দেহকোষে প্রবেশ করে বিষক্রিয়া ঘটায় ফলে কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা দমনের জন্য এই বিষ বিশেষ উপকারী। ফুরাডান, সানফুরান, এজোড্রিন, মুভাক্রন ও মেটাসিস্টক্স এই জাতীয় কীটনাশক। সব ধরনের কীটনাশক কম বেশি মাছ, অন্যান্য জলজ প্রাণী, মৌমাছি, পশু পাখি এবং মানুষের জন্য ক্ষতিকর। কাজেই কীটনাশক প্রয়োগে সাবধানতা প্রয়োজন। পড়ন্ত বিকালে কীটনাশক প্রয়োগ করা উত্তম, তাতে মৌমাছি ও উপকারী পোকা কম ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

ঙ) বিকর্ষক বিষ

যে কীটনাশক ব্যবহারের ফলে পোকা দূরে সরে চলে যায় তাদের বিকর্ষক বিষ বলে। যেমন- ন্যাপথিলন বল (মথ বল), এমজিকে ৮৭৪ (তেলাপোকা ও পিপড়া দমনের জন্য) নামক কীটনাশক বিকর্ষক বিষ বলে পরিচিত।

যন্ত্রপাতির প্রকারভেদ

- হাত মেশিন।
- পিঠে বহনযোগ্য মেশিন।
- পা চালিত মেশিন।
- জল প্রবাহ শক্তি চালিত মেশিন।
- কুয়াশা সৃষ্টিকারি (বাতাস তারিত) মেশিন।
- ঘন কুয়াশা সৃষ্টিকারি (উত্তপ্ত বাতাস তারিত) মেশিন।
- ঘূর্ণীয়মান থালা জাতীয় মেশিন।
- বিদ্যুৎ চালিত মেশিন।
- বিমান চালিত মেশিন।

কীটনাশক ব্যবহারে সুবিধা

- কম বিষ, কম খরচে বেশি এলাকায় প্রয়োগ করা যায়।
- কার্যকরভাবে ঈপ্সিত স্থানে বা লক্ষ্য বস্তুতে পৌঁছানো যায়।
- পরিবেশ কম দূষিত হয়।
- বিভিন্ন প্রকার প্রয়োগ যন্ত্রপাতির মধ্যে নিজ প্রয়োজনে উপযুক্তটি বেছে নেওয়া উত্তম।

কীটনাশক প্রয়োগ ও সাবধানতা

স্প্রে মেশিন দিয়ে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে। স্প্রে করার সময় আলাদা গাউন, জুতা, গ্যাস মাস্ক ও নিরাপদ চশমা ব্যবহার করতে হবে। কীটনাশক প্রয়োগের সময় আহার, ধূমপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কীটনাশকের খালি বোতল বা কৌটা মাটিতে পুতে ফেলতে হবে এবং কোনক্রমেই নদী, পুকুর বা জলাশয়ে ফেলা যাবে না এবং গৃহস্থলী কাজেও ব্যবহার করা যাবে না। বিষক্রিয়া হলে সাথে সাথে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

সপ্তম অধ্যায়

নার্সারির প্রধান প্রধান পোকা-মাকড় পরিচিতি ও তাদের ব্যবস্থাপনা

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে বাংলাদেশে প্রয়োজন পড়ছে আবাস ভুমির জন্য বিপুল পরিমাণ জায়গা। চাষযোগ্য জমি এবং নগরায়নের ফলেও প্রতিবছরই প্রয়োজন পড়ছে নতুন জমির। এই বাড়তি জমির প্রয়োজনে কাটা পড়ছে বনজ বৃক্ষ ও বৃক্ষজাত সম্পদ। দেশের অধিকাংশ লোকই জ্বালানী কাঠের জন্য নির্ভর করে থাকে বনজ বৃক্ষ ও গ্রামীণ বৃক্ষ সম্পদের উপর। আধুনিক নগরায়ন ও নগর সভ্যতার সাথেও কাঠের সর্ম্পক অত্যন্ত নিবিড়। তাই দিন দিন দেশ বৃক্ষ শূন্য হয়ে পড়ছে এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে। বন্যা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টির মত প্রাকৃতিক দুর্যোগে দেশ আজ জর্জরিত। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি হতে বাঁচতে হলে আমাদের এখনই ব্যাপক বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সফল করার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সুস্থ সবল চারা উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করা। নার্সারিতে চারা গাছ বিভিন্ন প্রকার পোকা-মাকড় দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সঠিক দমন ব্যবস্থা হাতে না নিলে বনায়ন কর্মসূচি ব্যহত হয়।

অতি পরিচিত কয়েকটি নার্সারির পোকা ও তাদের দমন ব্যবস্থা

১) উঁইপোকা ও পিঁপড়া

উঁই পোকা অনেক সময় সাদা পিঁপড়া বলে পরিচিত। এরা নার্সারির চারা গাছের মূল ও কান্ডের বাকল খেয়ে মারাত্মক ক্ষতি করে। শুষ্ক মৌসুমে এদের আক্রমণ বেশি হয়। এরা বীজতলায় বীজও খেয়ে ফেলে। ইউক্যালিপটাস, কড়ই, শাল, সেগুন, তেঁতুল, ইপিল-ইপিল, অর্জুন, পাইন ইত্যাদি চারা গাছে উঁই পোকার ব্যাপক আক্রমণ হয়। এ ছাড়া পিঁপড়া বীজতলার বীজ খেয়ে নার্সারির প্রভূত ক্ষতি সাধন করে এমনকি এদের জন্য কোন চারাই গজাতে পারে না।

চিত্র ঃ উঁইপোকা।

চিত্র ঃ পিঁপড়া।

দমন ব্যবস্থা ঃ ক্লোরপাইরিফস জাতীয় কীটনাশক, যেমন- ক্লাসিক ২০ ইসি বা ডার্সবান ১০ লিটার পানিতে ৩০ হতে ৪০ মি.লি. মিশিয়ে বীজতলার মাটি ভালভাবে ভিজাতে হবে। এতে পোকা দমন হবে।

২) উঁড়চুংগা

কয়েক ধরনের উঁড়চুংগা গাছের জন্য খুবই ক্ষতিকর। বিশেষ করে ক্রিকেট (Crickets) এবং মোলক্রিকেট (Molecrickets) বীজ তলার মাটিতে বাস করে বা পচা আবর্জনার নিচে থাকে। এরা চারা গাছের গোড়া বা ডালপালা কেটে দেয়, অনেক সময় টেনে নিজেদের গর্তে নিয়ে যায়। মার্চ-এপ্রিল মাসে এদের আক্রমণ বেশি হয়। শীতকালেও এদের আক্রমণ হতে পারে। *Brachytrypes* spp. ও *Gryllotalpa* spp. উল্লেখযোগ্য উঁড়চুংগা। শাল, সেগুন, শিশু, ঝাউ, ইউক্যালিপটাস, কড়ই, রাবার, মিনজিরি ইত্যাদি নার্সারিতে এদের আক্রমণ হয়।

চিত্র ঃ উঁড়চুংগা।

দমন ব্যবস্থা ঃ উঁড়চুংগার গর্তে পানি ঢেলে দিলে পোকা বেরিয়ে আসবে, এভাবে পোকা ধরে মেরে ফেলতে হবে বা হাঁস মুরগীকে খাওয়ানো যেতে পারে। অনেক সময় বিষ টোপ দিয়েও পোকা মারা যায়। প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২০ হতে ৩০ মি.লি. ম্যালাথিয়ন মিশিয়ে বীজতলার মাটি ভালভাবে ভিজাতে হবে। এতে পোকা দমন হবে।

৩) কাটওয়ার্ম

লেপিডপটেরা বর্গের এক ধরনের মথের লার্ভাকে কাটওয়ার্ম বলে। এরা বীজতলার মাটির ৩ হতে ৮ সে.মি. নিচে বাস করে এবং চারাগাছের ব্যাপক ক্ষতি করে। এরা রাতে মাটির উপরে আসে এবং চারা গাছের গোড়া কেটে দেয়। এদের লার্ভা অর্ধচন্দ্রাকৃতি। *Agrotis ipsilon* (Noctuidae : Lepidoptera) উল্লেখযোগ্য কাটওয়াম। এরা বহুভোজী বলে পরিচিত।

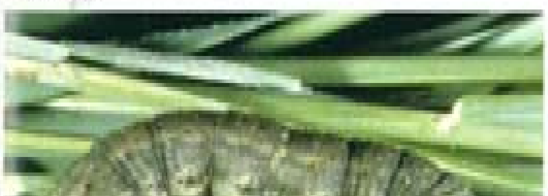

চিত্র ঃ লার্ভা।

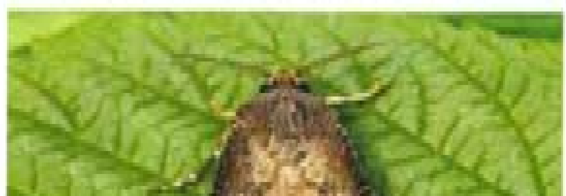

চিত্র ঃ পূর্ণাঙ্গ মথ।

দমন ব্যবস্থা ঃ বীজতলায় সেচ দিলে লার্ভা মাটির উপর উঠে আসে। তখন লার্ভা ধরে মেরে ফেলতে হবে। ক্লোরপাইরি জাতীয় কীটনাশক (ক্লাসিক, ডার্সবান) প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৩০ হতে ৪০ মি.লি. মিশিয়ে ভালভাবে স্প্রে মেশি সাহায্যে মাটিতে প্রয়োগ করলে পোকা দমন হবে।

৪) কক্‌কেফার

এটি বিটল জাতীয় পোকার লার্ভা। সাদা রঙের অর্ধচন্দ্রাকৃতি লার্ভা মাটির নিচে বাস করে। বনজ বৃক্ষের অধিকাংশ চা জন্য এরা ক্ষতিকারক। এরা চারার মূল ও প্রধানমূল খেয়ে ফেলে। ব্যাপক আক্রমণে চারা শুকিয়ে মরে যায়। পূর্ণাঙ্গ পো চারার পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করে। সেগুন, বাবলা, মিনজিরি, কড়ই ও পাইন জাতীয় গাছের চারা ব্যাপক ক্ষতি হয়। লিউকোফলিস, এনোমেলা ইত্যাদি প্রজাতি হচ্ছে পরিচিত ককেফার লার্ভার পূর্ণাঙ্গ পোকা।

চিত্র ঃ লার্ভা।

চিত্র ঃ পূর্ণাঙ্গ পোকা।

দমন ব্যবস্থা ঃ হাত দিয়ে পোকা সংগ্রহ করে মেরে ফেলতে হবে। সেচ দিয়ে পোকার লার্ভা সংগ্রহ করে মেরে ফেলতে হবে। বিষটোপ দিয়ে পোকা মেরে ফেলা যেতে পারে। নার্সারিতে এই পতঙ্গের আক্রমণ দেখা দিলে যে কোন স্পর্শ কীটনা শক যেমন ক্লাসিক অথবা ডার্সবান ১০ লিটার পানিতে ৩০ হতে ৪০ মি.লি. মিশিয়ে ভাল ভাবে স্প্রে করতে হবে।

৫) রস শোষণকারী পোকা / আঁশপোকা

জাব পোকা, জেসিড, মিলিবাগ, থ্রিপস ও স্কেল ইনসেক্ট জাতীয় পোকা গাছের পাতা, কুঁড়ি ও কাণ্ড হতে শোষকের মাধ্যমে রস চুষে নেয়। ফলে চারাগাছ দুর্বল হয়ে পড়ে, অনেক ক্ষেত্রে চারা শুকিয়ে মরে যায়। এই পোকাগুলি আকারে ক্ষুদ্র সাদামাছি, জাবপোকা এবং জেসিড জাতীয় পোকা অনেক সময় ভাইরাস জাতীয় রোগ ছড়ায়। ইপিল-ইপিল সাইলিড খুব ক্ষতিকর একটি রস শোষক পোকা।

দমন ব্যবস্থা ঃ পোকা আক্রমণের শুরুতে আক্রান্ত অংশ হতে ডিম ও পূর্ণাঙ্গ পোকা সংগ্রহ করে মেরে ফেলতে হবে ম্যালাথিয়ন, ডায়াজিনন, এজোড্রিন, নুভাক্রন নামক কীটনাশক (স্পর্শক ও অন্তর্বাহী) ১০ লিটার পানিতে অনুমোদিত মাত্রা মিশিয়ে স্প্রে করলে পোকা দমন হবে।

চিত্র ঃ আঁশপোকা বা স্কেল ইনসেক্ট।

৬) পাতাভোজী পোকা

পাতাভোজী পোকা নার্সারির চারা গাছের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। এদের অনেকে শুধুমাত্র পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করে। অনেক পোকা পাতার সবুজ অংশ খেয়ে জাল বানিয়ে ফেলে এবং কেউ পাতা মুড়িয়ে ভিতরে অংশ খায়। প্রজাপতি, মথ, বিটল ও ফড়িং জাতীয় পতঙ্গ পাতার বেশি ক্ষতি করে। ইউরেমা, ক্যাটোপসিলা, ফ্যারোটিস, এনোমেলা, পিরিস ইত্যাদি জাতীয় পোকা খুবই পরিচিত পাতাভোজী পতঙ্গ। কড়ই, লেবু, মিনজিরি, চিকরাশী, শাল, সেগুন, গর্জন, গামার, আম, ঝাউ, ইপিল ইপিল, শিশু ইত্যাদির চারা পাতাভোজী পোকা দ্বারা বেশি আক্রান্ত হয়।

চিত্র ঃ পাতাভোজী পোকার লার্ভা।

দমন ব্যবস্থা ঃ পোকা আক্রমণের শুরুতে ডিম, শুককীট ও মূককীট ধরে ধ্বংস করতে হবে। ডায়াজিনন, ম্যালাথিয়ন, পাইরিথ্রয়ড যেমন, সাইপ্রিন, ফাসটাক, রিপকর্ড ইত্যাদি কীটনাশক অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করে পোকা দমন করা যায়।

৭) কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা

এই জাতীয় পোকা গাছের কাণ্ড, অগ্রকাণ্ড ও ফলের অংশ খেয়ে ফেলে। মথ ও বিটল জাতীয় পোকা বেশি ক্ষতি করে। মেহগনি চারার অগ্রকাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা একটি অত্যন্ত ক্ষতিকারক পোকা। এর আক্রমণে নার্সারি ও চারা গাছ ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বেতের অগ্রকাণ্ড ছিদ্রকারী পোকাও একটি উল্লেখযোগ্য বালাই (মেহগনি শুটবোরার ও কেইন টপ শুটবোরার)।

চিত্র ঃ কাণ্ডছিদ্রকারী পোকার লার্ভা।

চিত্র ঃ ক্ষতির ধরণ।

দমন ব্যবস্থা ঃ আক্রান্ত কাণ্ড বা অগ্রকাণ্ড কেটে মাটিতে পুতে ফেলতে হবে। ডাইমিক্রন, বাইড্রিন ও মেটাসিস্টকস জাতীয় কীটনাশক অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করে পোকা দমন করা যায়। অন্তর্বাহী কীটনাশক ফুরাডান, সানফুরান, ফুরাকার্বন ইত্যাদি দানাদার ঔষধ ৫-১০ গ্রাম প্রতি গাছের গোড়ায় মাটিতে মিশিয়ে পানি দিতে হবে। এতে পোকা দমন হবে। এছাড়াও পাইরিথ্রয়েড জাতীয় কীটনাশক অথবা অন্তর্বাহী তরল কীটনাশক পরিমাণ মত মিশিয়ে আক্রান্ত নার্সারিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৮) মাকড়

মাকড় আর্থ্রোপোডা পর্বের এক ধরনের ক্ষুদ্র প্রাণী। এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এরা ৪ জোড়া পা বহন করে। এরা খুবই ক্ষুদ্র। চারা গাছের পাতা, মুকুল ও কান্ডের রস চুষে নেয়। ব্যাপক আক্রমণে গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে, পাতা শুকিয়ে যায়, অনেক সময় পাতা বিবর্ণ হয়।

চিত্র ঃ ক্ষুদে মাকড় আক্রান্ত পাতা।

চিত্র ঃ ক্ষুদে মাকড়।

দমন ব্যবস্থা ঃ এদের দমনের জন্য বিশেষ ধরনের বিষ ব্যবহার করা হয় যাদেরকে মাকড়নাশক বা ওমাইটিসাইড বলে। কেলথেন, অভেক্স, পারফেকথিয়ন, সালফোটক্স, টলস্টার, টিডফেট ও নিউরোন জাতীয় মাকড়নাশক মাকড় দমনের জন্য ব্যবহার করতে হবে।

অষ্টম অধ্যায়

বনজ বৃক্ষের ক্ষতিকর পোকা-মাকড় ও তাদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

১। সেগুনের পাতাভোজী পোকা

পোকার নাম ঃ *Hyblaea puera* Cramer (Hyblacidae: Lepidoptera)

ক্ষতির প্রকৃতি ঃ প্রাথমিক অবস্থায় এ পোকার শুককীট কচি পাতার প্রধান প্রধান শিরা-উপশিরা বাদে সম্পূর্ণ পত্রফলক খেয়ে ফেলে। শুককীট পাতার কিনারা মুড়িয়ে তার ভিতরে খেতে শুরু করে। আক্রমণ বেশি হলে সম্পূর্ণ চারা সপ্তাহ খানেকের মধ্যে পত্রশূন্য হয়ে পড়ে। অনেক সময় ডগা শুকিয়ে চারা মারা যায়।

চিত্র ঃ পাতাভোজী পোকাক্রান্ত সেগুনের পাতা।

চিত্র ঃ পাতাভোজী পূর্ণাঙ্গ পোকা।

ব্যবস্থাপনা ঃ বাগান আগাছামুক্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে পোকার ডিম ও শুককীট হাত দিয়ে ধরে মেরে ফেলতে হবে।

প্রতিকার ঃ আক্রমণের শুরুতে ভেষজ বিষ (নিমবিসিডিন) ৪ মি.লি./১ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে পাতা, ডাল-পালা ও কাণ্ড ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। আক্রমণ ব্যাপক হলে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি ২-৩ মি.লি./১ লি. পানিতে মিশিয়ে পাতা, ডাল-পালা ও কাণ্ড ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।

২। মেহগনির ডগা ছিদ্রকারী পোকা

পোকার নাম ঃ *Hypsipyla robusta* Moore (Pyralidae: Lepidoptera)।

ক্ষতির প্রকৃতি ঃ শুককীট চারার ডগায় ছিদ্র করে ভিতরে প্রবেশ করে। কাণ্ডে লম্বালম্বি সুড়ঙ্গ তৈরি করে কাণ্ডের শাঁস খায়। সুড়ঙ্গটি ৬০ সে.মি. পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে। আক্রান্ত চারা গাছের ডগা শুকিয়ে মারা যায়। চারার বৃদ্ধি ব্যহত হয় ও কাণ্ড ঝোপাকৃতির হয়। ঘন ঘন আক্রমণে সম্পূর্ণ চারা মরে যেতে পারে।

চিত্র ঃ ডগা ছিদ্রকারী পোকাক্রান্ত মেহগনি গাছ।

চিত্র ঃ ডগা ছিদ্রকারী পূর্ণাঙ্গ পোকা।

ব্যবস্থাপনা ঃ নিয়মিত বাগান পর্যবেক্ষণ করতে হবে। সব সময় আগাছামুক্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। উপরি বা পার্শ্ব ছায়াযুক্ত স্থানে নার্সারি স্থাপন করতে হবে। মেহগনি চারার পাশাপাশি তুন, চিকরাশি ইত্যাদি চারা উত্তোলন পরিহার করতে হবে। পোকাসহ আক্রান্ত ডগা কেটে মাটিতে পুতে অথবা ধারালো ছুরি বা ব্লেড দিয়ে চিরে ভিতরে অবস্থিত পোকা মেরে ফেলতে হবে। সুঁচ ফুটিয়ে ভিতরে অবস্থিত পোকা মেরে ফেলতে হবে।

প্রতিকার ঃ প্রতি শতক মাটিতে ৪০-৫০ গ্রাম দানাদার অন্তর্বাহী কীটনাশক (যেমন ফুরাডান বা কুরাটার ৫ জি) প্রয়োগ করতে হবে। চারা প্রতি ৬-১০ গ্রাম ঔষধ গোড়ায় প্রয়োগ করে প্রচুর পানি সেচ দিতে হবে যাতে শিকড়ে পৌঁছায়।

৩। কড়ই এর পাতাভোজী পোকা

পোকার নাম ঃ *Eurema* spp., *Catopsilia* spp. (Pieridae: Lepidoptera)

ক্ষতির প্রকৃতি ঃ শুককীট পাতার মধ্যশিরা ছাড়া সকল অংশ খেয়ে ফেলে। আক্রমণ বেশি হলে সমস্ত গাছই পত্রশূন্য হয়ে পড়ে। ঘন ঘন আক্রমণের ফলে চারা দুর্বল হয়ে পড়ে, বৃদ্ধি ব্যহত হয়, এমন কি মারাও যেতে পারে। কড়ই ছাড়াও এরা সোনালু, রেইনট্রি, মিনজিরি, লোহাকাঠ ইত্যাদি গাছের চারা আক্রমণ করে।

চিত্র ঃ পোকাক্রান্ত কড়ই গাছ।

চিত্র ঃ পাতাভোজী পূর্ণাঙ্গ পোকা।

ব্যবস্থাপনা ঃ বাগান সব সময় আগাছামুক্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। পাতায় অবস্থিত ডিমের গাদা ও শুককীট সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে। হাত জাল দিয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি ধরে মেরে ফেলতে হবে। পতঙ্গভোজী পাখি যাতে শুককীট ধরে খেয়ে ফেলতে পারে, সে ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রতিকার ঃ ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি বা ডায়াজিনন ৬০ ই ২-৩ মি.লি./১ লিটার পানিতে মিশিয়ে চারার পাতা ও শাখা-প্রশাখায় ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।

৪। অর্জুন পাতার গল পোকা

পোকার নাম ঃ *Trioza fletcheri* Crawford (Psyllidae: Hemiptera)

ক্ষতির প্রকৃতি ঃ অপূর্ণাঙ্গ পোকা বা নিম্ফ কচি পাতার রস চুষে খায়। আক্রান্ত স্থানে ছোট গুটি বা টিউমারের সৃষ্টি হয় যাকে গল বলে। গলগুলো উজ্জল, লাল, হলুদ বা বাদামী রঙের হয় এবং পরিপক্ক হয়ে কালচে রঙ ধারণ করে। একটি পাতায় অসংখ্য গলের সৃষ্টি হয়। পাতা বিকৃত হয়ে নষ্ট হয় এবং চারার ডগা শুকিয়ে মারা যায়।

চিত্র ঃ গল পোকাক্রান্ত অর্জুন পাতা।

চিত্র ঃ পূর্ণাঙ্গ গল পোকা।

ব্যবস্থাপনা ঃ নিয়মিত বাগান পর্যবেক্ষণ করতে হবে। পোকাক্রান্ত পাতা কেটে মাটিতে পুতে বা আগুনে পুড়ে ফেলতে হবে। বাগান আগাছামুক্ত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। সুষম খাদ্যের যোগান দিতে হবে।

প্রতিকার ঃ প্রতি লিটার পানিতে ১-২ মি,লি, হারে অন্তর্বাহী বা প্রবাহমান কীটনাশক, যেমন- নাইট্রিন ৮৭ ইসি বা পারফেকথিয়ন ৪০ ইসি মিশিয়ে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে।

৫। নিমের রস শোষক বা মশক বাগ

পোকার নাম ঃ *Helopeltis antonii* Signoret (Capsidae: Hemiptera)

ক্ষতির প্রকৃতি ঃ চারা গাছ ও রোপণকৃত ছোট গাছের কচি শাখার নরম বাকল ও পাতা ছিদ্র করে রস শোষণ করে। পাতা ও শাখা কাল হয়ে কুঁকড়ে যায় অথবা সম্পূর্ণ শাখা উপর থেকে নিচের দিকে শুকিয়ে মরে যায়। ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে ক্ষতি সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়।

চিত্র ঃ পোকাক্রান্ত নিম গাছ।

চিত্র ঃ নিমের মশক বাগ।

ব্যবস্থাপনা ঃ বাগান সব সময় আগাছামুক্ত ও পরিস্কস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। ডিম পাড়ার স্থান দৃষ্টিগোচর হলে সেটি কেটে মাটিতে পুতে ফেলতে হবে। নিমের বেড়ের আশে-পাশে অন্যান্য শোষক গাছের চারা উত্তোলন পরিহার করতে হবে। মাটিতে পটাশ সারের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে।

প্রতিকার ঃ প্রতি লিটার পানিতে ২-৩ মি,লি, হারে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি মিশিয়ে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে।

৬। ইপিল ইপিল সাইলিড পোকা

পোকার নাম ঃ *Heteropsylla cubana* Crawford (Psyllidae: Hemiptera)

ক্ষতির প্রকৃতি ঃ এ পোকা কচি পাতা ও কান্ডের অগ্রভাগ হতে রস শোষণ করে। ফলে পাতা হলুদ হয়ে অগা কুঁকড়ে যায় অথবা শুকিয়ে মরে যায়। ব্যাপক আক্রমণে চারা সম্পূর্ণ পত্রশূন্য হয়ে পড়ে। গাছের পাতা ও কচি ডালে কালো দাগ পড়ে, ফলে খাদ্য তৈরিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

চিত্র ঃ সাইলিড আক্রান্ত ইপিল ইপিল গাছ।

চিত্র ঃ ইপিল ইপিল এর সাইলিড পোকা।

ব্যবস্থাপনা : বাগান সব সময় আগাছামুক্ত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। আক্রান্ত ডগা ও শাখা প্রশাখা কেটে মাটিতে পুতে বা পুড়ে ফেলতে হবে। প্রাকৃতিকভাবে দমনের জন্য লেডি বার্ড বিটল ও মাকড়সাকে বাগানে সংরক্ষণ করতে হবে। সাইলিডের আক্রমণ প্রতিরোধক্ষম জাত নির্বাচন করে চাষ করতে হবে।

প্রতিকার : প্রতি লিটার পানিতে ২-৩ মি.লি. হারে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি বা ডায়াজিনন ৬০ ইসি মিশিয়ে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে।

৭। কাঠ বাদামের পাতাভোজী পোকা

পোকার নাম : *Metanastria hyrtaca* Cramer (Lasiocampidae: Lepidoptera)

ক্ষতির প্রকৃতি : শুককীট সম্পূর্ণ কচি পাতা খেয়ে শেষ করে ফেলে। শুককীট অনেক বড় আকারের বিধায় অল্প সংখ্যক হলেও গাছের মারাত্মক ক্ষতি করে। শুককীটগুলো দিনে ছায়াযুক্ত স্থানে লুকিয়ে থাকে এবং রাতে সক্রিয় হয়।

চিত্র : পোকাক্রান্ত কাঠ বাদামের পাতা।

চিত্র : কাঠ বাদামের পাতাভোজী পূর্ণাঙ্গ পোকা।

ব্যবস্থাপনা : শুককীট হাত দিয়ে ধরে মেরে ফেলতে হবে।

প্রতিকার : প্রতি লিটার পানিতে ২-৩ মি.লি. হারে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি অথবা ১ মি.লি. সাইপ্রিন ১০ ইসি মিশিয়ে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে যাতে সম্পূর্ণ চারা ভিজে যায়।

নবম অধ্যায়

সমন্বিত রোগ-বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

ক) সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম)

একাধিক সুবিধাজনক কলা-কৌশল ব্যবহার করে এবং পরিবেশের কোন ক্ষতি না করে আপদ নিয়ন্ত্রণ করাকেই সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা বা IPM (Integrated Pest Management) বলে। অর্থাৎ বিভিন্ন দমন কৌশল প্রয়োগ করে যখন কোন ক্ষতিকারক পোকার আক্রমণ ফসলের ক্ষতিসীমার নিচে রাখা যায় এবং যাতে পরিবেশের কোন ক্ষতি না হয় তাকে সংক্ষেপে আইপিএম বা সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা বলে। বর্তমান বিশ্বে আইপিএম পোকা দমনের জন্য খুবই জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। এর মূল কারণ বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যে রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যাপক ক্ষতিকর বিষয়ে অবগত হয়েছেন যা জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সমন্বিত আপদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞদের একটি প্যানেল সমন্বিত আপদ ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে, আপদ ব্যবস্থাপনা হচ্ছে একটি পদ্ধতি, যা সংশ্লিষ্ট পরিবেশ এবং আপদের প্রজাতির সমগোষ্ঠীর গতিময়তা (Population dynamics) কে বিবেচনায় এনে আপদ দমনের সমস্ত উপযোগী কৌশল ও পদ্ধতিকে সুসঙ্গতভাবে ব্যবহার করে এবং সমগোষ্ঠী এমন একটি স্তরে রাখে যেখানে তারা শস্যের অর্থনৈতিক ক্ষতি করতে পারে না।

আইপিএম এর উপকারিতা

- আইপিএম গ্রহনের ফলে উপকারী পোকা মাকড়, মাছ, ব্যাঙ, পশু, পাখি ও গুইসাপ প্রভৃতি সংরক্ষণ করা যায়।
- বালাইনাশকের যুক্তি সঙ্গত ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়, যথেচ্ছা ব্যবহার না হওয়ায় উৎপাদন খরচ কমে।
- বালাইনাশকের পরবর্তী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রোধ করা সম্ভব হয়। এতে করে বালাইনাশক জনিত দুর্ঘটনা সহজেই এড়ানো যায়।
- ক্ষতিকারক পোকা-মাকড় বালাইনাশক সহনশীলতা অর্জন করার সুযোগ পায় না।
- বালাই এর পুনরাবৃত্তি ঘটার সম্ভাবনা কম।
- সর্বোপরি পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে এবং দূষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়।

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হয়

১। উপকারী পোকামাকড় ও প্রাণী সংরক্ষণ এবং এগুলোর বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান

ক. জৈবিক দমনে ব্যাঙ, চিল, পেঁচা, গুইসাপ, মাকড়সা, লেডী বার্ড বিটল, ক্যারাবিড বিটল, বোলতা, মিরিড বাগ, ওয়াটার বাগ, ড্যামসেল ফড়িং প্রভৃতি উপকারী পোকামাকড়কে ধ্বংস করা যাবে না বরং তাদের বংশবৃদ্ধি করতে হবে যাতে তারা ক্ষতিকারক পোকা দমনে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে।

খ. উপকারী পোকামাকড়ের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য- নার্সারির পাশে শিম ও শসা জাতীয় ফসল আবাদ করা যেতে পারে। বালাইনাশকের এলোপাতাড়ি ব্যবহার পরিহার করতে হবে।

গ. বিদেশ থেকে পরজীবি ও পরভোজী পোকা আমদানী করে এগুলোর প্রতিষ্ঠা করা এবং কৃত্রিম খাদ্য সরবরাহের মাধ্যমে দেশীয় পরজীবি ও পরভোজী পোকার সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ।

২) পোকামাকড় ও রোগবালাই সহনশীল জাতের বীজ/চারা রোপন

- উন্নত জাতের মাতৃবৃক্ষ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- পোকামাকড় ও রোগবালাই মুক্ত বীজ লাগাতে হবে।
- পতঙ্গ প্রতিরোধী জাত রোপন করতে হবে।

৩) আধুনিক পদ্ধতিতে নার্সারি উৎপাদন

- চারা গাছের পর্যায়ক্রম/একই নার্সারিতে বছরের পর বছর একই প্রজাতির চারা না উত্তোলন।
- চারার অবশিষ্টাংশের ধ্বংস সাধন এবং নার্সারি আগাছা মুক্ত রাখা।
- গভীর করে জমি চাষ দেয়া এবং মাটিতে রোদ খাওয়ানো।
- শস্য রোপণ/বপণ ও কাটার সময় পরিবর্তন।
- জমিতে সুষম সার প্রয়োগ করা।
- জমিতে যথাসময়ে সেচ দেয়া ও পানি নিষ্কাশন।
- আগাছা, কীট পতঙ্গের বিকল্প পোষক গাছ ও অন্য প্রয়োজনীয় গাছ ধ্বংস করা।
- নির্দিষ্ট দূরত্বে গাছ বা চারা লাগানো।
- আপদের সমগোষ্ঠীর জনসংখ্যাকে এমন স্তরে রাখা যাতে ফসলের অর্থনৈতিক ক্ষতি না হয়।

৪) যান্ত্রিক দমন পদ্ধতির প্রয়োগ

- হাত দিয়ে পোকার ডিম, শুককীট, মুককীট ধরে মেরে ফেলা।
- জমির উপর দিয়ে কেরোসিন মাখা রশি টেনে দেয়া।
- প্রতিবন্ধক ও আঠালো পদার্থ ব্যবহার করে কীটপতঙ্গের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করা।
- হাত জাল দিয়ে পোকা ধরে মেরে ফেলা।
- ঝাঁকুনির সাহায্যে শত্রু পোকাকে গাছ থেকে নিচে ফেলে দেয়া এবং কেরোসিন মিশ্রিত পানিতে চুবিয়ে মেরে ফেলা।
- আলোর ফাঁদ দিয়ে পোকা ধরে মেরে ফেলা।
- আর্দ্রতার তারতম্য ঘটানো।
- জমিতে ডালপালা/বাঁশের কঞ্চি পুতে পোকাখাদক পাখির বসার ব্যবস্থা করা।
- আক্রান্ত পাতার আগা কেটে দেওয়া।

৫) রাসায়নিক দমন ব্যবস্থা

- নিয়মিতভাবে অপকারী ও উপকারী পোকামাকড়ের উপস্থিতি জরিপ করা।

- সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে কেবল আক্রান্ত জমিতে সঠিক বালাইনাশক, সঠিক সময়, সঠিক মাত্রায় ও সঠিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করা।

প্রথম ৪টি উপাদানের সাহায্যেও যদি ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও রোগের আক্রমণ দমিয়ে রাখা সম্ভব না হয়, কেবল তখনই সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে বালাইনাশক ব্যবহার করা অর্থাৎ পোকার সংখ্যা অর্থনৈতিক দ্বারপ্রান্তে (ইটিএল) পৌঁছে গেলে তখনই বালাইনাশক সঠিকভাবে ব্যবহার করা দরকার।

যে সমস্ত কারণে রোগ ও পোকার আক্রমণ ঘটতে পারে

- একই প্রজাতির শস্য বার বার চাষ।
- নতুন শস্য বা ফসলের চাষ।
- নতুন পোকা মাকড় বা রোগ বালাই এর আগমন।
- নতুন পরিবেশে (জলবায়ু অঞ্চল) ফসল চাষ।
- প্রজননের মাধ্যমে ফসলের নতুন জাত উদ্ভাবন।
- গাছের/চারার নির্দিষ্ট ঘনত্ব বজায় না রাখা।
- একই জমিতে একই ফসলের বার বার চাষ করা।
- সুষম মাত্রায় পুষ্টির যোগান না দেয়া (গোবর, জৈব সার ও নিম খৈল)।
- শস্য ক্ষেত হতে বা আশপাশ হতে বিকল্প পোষক সরিয়ে না ফেলা।
- অপ্রয়োজনে ঘন ঘন বালাইনাশক ব্যবহার করা। কারণ ঘনঘন বালাইনাশক ব্যবহার করলে পোকা এর প্রতি সহনশীল হয়ে উঠে।
- অধিক বালাইনাশক প্রয়োগে বন্ধু পোকা ও পরজীবির সংখ্যা কমে যাওয়া।

চিত্র ঃ সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম)।

খ) সমন্বিত রোগ ব্যবস্থাপনা (আইডিএম)

সমন্বিত রোগ ব্যবস্থাপনা (আইডিএম) হল একটি পদ্ধতি যা রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন মাফিক কীটনাশক ব্যবহারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং কেবলমাত্র রোগের ঘটনা যখন অর্থনৈতিক প্রান্তিক সীমায় পৌঁছায় তখনই প্রয়োগ যোগ্য। এটি শস্যের ইকোসিস্টেমে অনেক জৈব নিয়ন্ত্রকের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। অন্যভাবে, আইডিএম উদ্ভিদ রোগ দমন ব্যবস্থার সকল ব্যবস্থাপনা যথা সাংস্কৃতিক, জৈবিক ও রাসায়নিক পদ্ধতির সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে রোগের মাত্রা অর্থনৈতিক প্রান্তিক সীমার নিচে রাখাকে বুঝায়। সমন্বিত রোগ ব্যবস্থাপনায় পরিবেশকে দূষণমুক্ত রেখে এক বা একাধিক কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কার্যকরী এ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষতিকে কমানো এবং কীটনাশকের সময়োপযোগী ও যুক্তি সঙ্গত ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

উদ্দেশ্য

- গাছে রোগের আক্রমণের হার কমানো।
- রোগ বিস্তারের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে বাধা প্রদান।
- একাধিক রোগ জীবাণুর সমন্বিত ব্যবস্থাপনা।
- অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক এবং পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নয় এমন রাসায়নিক এর ব্যবহার।
- একাধিক দমনমূলক কৌশলের সমন্বিত ব্যবহার।

মূলনীতি

সমন্বিত রোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ৬টি মূলনীতি এর উপর প্রতিষ্ঠিত-

১) বর্জন (Exclusion)

- একটি এলাকায় বা বাগানে রোগ সৃষ্টিকারী এজেন্ট (প্যাথোজেন) এর আগমনকে বাধা প্রদান।
- কোয়ারেন্টাইন, ফসল পরিদর্শন এবং বীজ সার্টিফিকেশন ও বাহক নির্মূলকরণ।

২) পরিহার (Avoidance)

- পোষক গাছকে রোগ জীবাণুর সংস্পর্শ এড়াতে সক্ষম করা বা রোগ জীবাণুর জন্য অনুকূল অবস্থার সাথে মিলে না যায় তা নিশ্চিত করা।
- এই কৌশল গুলির মধ্যে রয়েছে ভৌগলিক অঞ্চল নির্বাচন, ক্ষেত্র নির্বাচন, বপন বা রোপনের সময় নির্বাচন এবং রোগ সহনশীল জাত নির্বাচন।

৩) নির্মূল (Eradication)

- রোগ জীবাণু একটি এলাকায় প্রবর্তনের পর তা ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ার আগে নির্মূল করা।
- ইনোকুলাম বৈচিত্র্যকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যেখানে এটি উল্লেখযোগ্য ক্ষতি করতে না পারে।
- এটি জৈবিক উপায়ে, শস্যাবর্তন, দৈহিক এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করা হয়।

৪) সুরক্ষা (Protection)

- এই নীতিটি প্যাথোজেন এবং হোস্ট প্লান্ট অংশের মধ্যে বাধা স্থাপনের উপর নির্ভর করে।
- এটি রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে করা হয়, যেমন- ছত্রাকনাশক, জীবাণুনাশক বা নেমাটোসাইড।

৫) হোস্ট প্রতিরোধ (Host resistance)

- রোগ প্রতিরোধী জাত এর উন্নয়ন করা।
- টিস্যুকালচার, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশনের মতো জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করা।

৬) থেরাপি (Therapy)

- সুস্থ উদ্ভিদ প্রজাতি নির্বাচন করা।
- থেরাপি একটি নিরাময় মূলক পদ্ধতি যা উদ্ভিদ সংক্রমিত হওয়ার পর প্রয়োগ করা হয়।
- কেমোথেরাপি, তাপ বা থার্মোথেরাপি প্রয়োগ করা।

দমন ব্যবস্থা

১। হোস্ট প্রতিরোধ বা রোগ প্রতিরোধী উদ্ভিদ নির্বাচন

উদ্ভিদের রোগপ্রতিরোধী ক্ষমতা রোগবিস্তার ও দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে রোগ প্রতিরোধী জেনোটাইপ ব্যবহারের মাধ্যমে রোগের মাত্রা সহনীয় পর্যায়ে দমন করা যায়। রোগ প্রতিরোধক্ষম জেনোটাইপ ব্যবহারের ফলে রোগের প্রকাশ দেরিতে হয়। রোগের বৃদ্ধির হার ধীরে ধীরে ঘটে এবং ফসলের সামান্য মাত্রার ক্ষতি হয়ে থাকে।

২। জৈবিক দমন

জৈবিক দমন ব্যবস্থায় অন্য একটি জীবের মাধ্যমে রোগসৃষ্টিকারী জীবানুকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

যেমন। মাটিতে বসবাসকারী অনেক ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া এবং নেমাটোড আছে যারা গাছের ক্ষতি করে না বরং রোগসৃষ্টিকারী জীবানুকে নিষ্ক্রিয়, এমনকি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে পারে।

৩। সাংস্কৃতিক দমন ব্যবস্থা/চাষের পদ্ধতিগত ব্যবস্থার মাধ্যমে রোগ দমন

রোগ সৃষ্টিকারী জীবানুকে বিতাড়নের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করাকে সাংস্কৃতিক দমন ব্যবস্থা বলে। রোগ জীবানু বিতাড়নের জন্য বিভিন্ন প্রকার বিতাড়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। যেমন– রোগ সৃষ্টিকারী জীবানুর জীবন চক্র পূর্ন করার জন্য বিকল্প গাছ ধ্বংস করা, প্রতি বছর ফসলের সাথে অন্য ফসলের পর্যায়ক্রমে চাষ করা, দুই বা ততোধিক ফসলের এক সাথে চাষ করা, জমি আগাছা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, জমিতে সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করা। সর্বোপরি নিরোগ বীজ ব্যবহার করে এবং বীজ বপনের সময় আগে/পরে নিয়ে রোগ দমন করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে জমিতে চারার সংখ্যা ও ঘনত্ব সঠিক রাখার মাধ্যমেও রোগ দমন করা যায়।

৪। রাসায়নিক দমন

সমন্বিত রোগ দমন ব্যবস্থাপনায় বিচক্ষনতার সাথে কেবল মাত্র প্রয়োজনানুসারে রাসায়নিক প্রয়োগ করে রোগ দমন করা হয়। যে সমস্ত ক্ষেত্রে উদ্ভিদ জন্মানোর প্রাথমিক পর্যায়ে এবং পরিবেশের কারনে দ্রুত রোগের বিস্তার ঘটে সে সমস্ত ক্ষেত্রে রাসায়নিক প্রয়োগ (ছত্রাক, কীট ও আগাছা নাশক) করে রোগ বালাই দমন করা যায়।

উপকারিতা

- ক্ষতিকর রাসায়নিক ছত্রাকনাশকের পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। এতে করে ছত্রাকনাশকের যথেচ্ছা ব্যবহার না হওয়ায় উৎপাদন খরচ কমে যায়।
- ছত্রাকনাশকের পরবর্তী পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রোধ করা যায়। এতে করে বিষক্রিয়া জনিত দুর্ঘটনা সহজেই এড়ানো যায়।
- ক্ষতিকর রোগ জীবাণু ছত্রাকনাশক সহনশীলতা অর্জন করার সুযোগ পায় না।
- রোগ এর পুনরাবৃত্তি ঘটার সম্ভাবনা কমে যায়।
- সুস্থ সবল উদ্ভিদ নিশ্চিত করা যায়।
- টেকসই জৈব ভিত্তিক রোগ ব্যবস্থাপনার বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
- উপকারী অণুজীব প্রজাতিকে রক্ষা করা যায়।
- বিভিন্ন পদ্ধতি সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে ছত্রাকনাশক ও কীটনাশকের ব্যবহার কমানো যায়।
- রোগ ব্যবস্থাপনায় খরচের পরিমান সীমিত রাখা যায়।
- সর্বোপরি পরিবেশের ভারসাম্য এবং দূষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়।

চিত্র: সমন্বিত রোগ ব্যবস্থাপনা (আইডিএম)।

উপসংহার

সমন্বিত রোগ-বালাই ব্যবস্থাপনায় ছত্রাক ও কীটনাশকের ব্যবহার খুবই পরিমিত ও প্রয়োজন মাফিক হয়, এতে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ দূষণ হয় না বললেই চলে। সমন্বিত রোগ-বালাই ব্যবস্থাপনা একটি প্রযুক্তি নির্ভর রোগ ও কীট-পতঙ্গ দমন কৌশল, এর জন্য এক দল দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজন পড়ে। তাই বাংলাদেশে এখনও আইপিএম ও আইডিএম এর ব্যবহার ব্যাপক হারে লক্ষ্য করা যায় না।

যোগাযোগ : বিভাগীয় কর্মকর্তা, বন রক্ষণ বিভাগ

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

টেলিফোন : +৮৮ ০২ ৩৩৪৪৮১৫৬৯ ই-মেইল : dofpd@bfri.gov.bd ওয়েবসাইট : www.bfri.gov.bd